মহাত্মা গান্ধীর বাণী

সঙ্কলন ও সম্পাদনা
ইউ-এস-মোহন রাও

প্রকাশন বিভাগ



মহাত্মা গান্ধীর বাণী

ইউ-এস-মোহন রাও কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

বিষয় সূচী

পৃষ্ঠা

সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৮৯৩)
September, 1971 (Bhadra-Asvin, 1893)

THE MESSAGE OF MAHATMA GANDHI (Bengali)

Price : 1·50
মূল্য : ১·৫০

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পাতিয়ালা হাউস, নূতনদিল্লী-১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং কৃপাল প্রিন্টিং প্রেস, শক্তিনগর, দিল্লী-৭ দ্বারা মুদ্রিত।

সত্যমেব জয়তে

রাষ্ট্রপতিভবন
নূতনদিল্লী—৪
২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

শ্রী ইউ. এস. মোহন রাও "মহাত্মা গান্ধীর বাণী" শীর্ষক এক সঙ্কলন গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন একথা জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। এই সঙ্কলন গ্রন্থ সম্পাদনার সময় সঙ্কলন কর্তার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ছিল দ্বিবিধ: মহাত্মার বাণী, এক সুসংবদ্ধ মুল্যবোধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকরূপে প্রদত্ত বিশেষ নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে উপস্থাপিত করা। আশাকরি এরফলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, গান্ধীজার শিক্ষা সময়োপযোগী ও গ্রহণযোগ্য তো বটেই, সেই সঙ্গে তা সর্বকালের ও সর্ব অবস্থার উপযোগী এক স্থায়ী জাবন দর্শন রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। "কুড়ি বছর পরে"—এই সুবিধাজনক স্থান থেকে গান্ধীজার সমৃদ্ধশালী রচনাবলী নতুন করে অনুশীলনের ভিত্তিতে এভাবে সঙ্কলনযোগ্য অংশগুলি সাজানো হয়েছে যাতে গান্ধীজীর পরিচিত ও ও অপেক্ষাকৃত অপরিজ্ঞাত, এই উভয়বিধ রচনাই সমভাবে ফলপ্রসূ হয়। আশাকরি গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে পঠিত হবে।

(স্বাঃ) জাকির হোসেন

ভূমিকা

গান্ধীজীর অসংখ্য রচনা এবং বক্তৃতা থেকে নির্বাচিত করে এই ছোট সঙ্কলন গ্রন্থটি তৈরি হয়েছে। কোন কাজ সুনির্দিষ্টভাবে করা উচিত বা কোনটা উচিত নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মাজী যে সমস্ত বক্তৃতা তাঁর নানা ধরনের সমর্থকদের কাছে দিয়েছিলেন তা থেকে নিয়ে সুসঙ্গতিপূর্ণ প্রণালীতে উপস্থাপিত করাই হল বর্তমান সঙ্কলকের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা। আশাকরা যাচ্ছে যে এর ফল যা হয়েছে তাতে বাণীগুলি যখন উচ্চারিত হয়েছিল তখন যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে এর ভেতর এমন একটি জীবন দর্শন রূপ পেয়েছিল যা সর্বকালের এবং পারিপার্শ্বিকের উপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। "কুড়ি বছর পরের" সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়িয়ে বিরাট রচনা সম্ভারকে নতুন করে অনুধাবন করে এই নির্বাচিত অংশগুলির মধ্যে অতি পরিচিত এবং কম পরিচিত এই দুই রকমেরই অংশের সাহায্যে কার্য্যকরীভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

নানা কারণে এই ধারণা আজকাল আছে যে যদিও গান্ধীজী জননেতা এবং সাধু প্রকৃতির লোক হিসেবে প্রশংসনীয় ছিলেন, তবুও তাঁর রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কীত ধ্যান ধারণা প্রগতি বিরোধী, আজকাল অচল এবং বর্তমান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সেগুলি খাপ খায়না।

এই ধারণা যে কতখানি ভুল তা কেবল গান্ধীজীর রচনা পড়লেই এবং তাঁর শিক্ষার সারাংশ বোঝবার চেষ্টা করলেই জানা

যাবে। মানব ইতিহাসে তাঁর চাইতে বড় সাধু, দার্শনিক, চিন্তাকারী, বৈজ্ঞানিক, কূটনীতিজ্ঞ অনেক জন্মেছেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে যাঁদের দান অসামান্য। কিন্তু গান্ধী কেবল একজনই হয়েছেন, কারণ যখন তিনি সক্রিয়ভাবে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানর জন্য জন আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তিনি একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং রাজনীতিগতভাবে স্বরাজের পরিকল্পনা করেছিলেন। এবং তিনি চিন্তা এবং পরীক্ষার সাহায্যে এমন একটা জীবন দর্শন রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন যার যাথার্থ্য চিরকাল বজায় থাকবে। তিনি যে সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় নির্দেশ করেছিলেন তার সহজতায় আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় এবং বহুলোক যার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

গান্ধীশতবার্ষিকীতে গান্ধীজীর জীবন ও শিক্ষার ব্যাপারে পৃথিবীময় কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি যথাযথভাবে অনুধাবন করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, যখন গান্ধীজী আদর্শবাদকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হতেন তখন দেখা যেত তাঁর আদর্শকে রূপ দিতে তিনি প্রচণ্ডভাবে বাস্তবধর্মীতার আশ্রয় নিতেন। তাঁর সত্য এবং অহিংসা বিষয়ক মূলনীতি থেকে তাঁকে নড়ানো যেত না, কিন্তু এগুলিকে রূপ দিতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা চালাতেন এবং অনুশীলনের সাহায্যে অগ্রসর হতেন। তাঁর দ্বন্দ্বমূলক প্রতিজ্ঞাগুলিতে কোনক্রমেই শেষ কথা ছিল না, আরো পরীক্ষার পর সেগুলিকে উন্নত করা যেত।

সংক্ষেপে বলতে হলে, গান্ধীজী ছিলেন একজন সমাজ বিজ্ঞানী যিনি সমাজের অন্যায়গুলিকে বিশ্লেষণ করতেন এবং সেগুলিকে কেমন করে দূর করা যায় তা সমস্ত ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট লোকজনকে বিচার করে স্থির করতেন। যদি তাঁর ধারণাগুলি অবাস্তব বলে মনে হয় তাহলে তা তাঁর সময়ের চাইতে অনেক এগিয়ে আছে বলেই।

কেবল ঈশ্বর আছেন

সঙ্কলনগুলিকে আট অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বর সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর অমর বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে: "ঈশ্বর আছেন, ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন।" ঈশ্বর তাঁর কাছে কোনো বাইরের জিনিস নন, তিনি মানুষের হৃদয়ে সর্বদাই রয়েছেন। যে প্রাণময় আইন সমস্ত বিশ্বকে চালায় তাতে বিশ্বাস না করলে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করা অসম্ভব। যে মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই তার অবস্থাটা এক ফোঁটা জল সমুদ্রে ফেলে দেবার মত—যারফলে সেটার অস্তিত্ব আর থাকে না। যদি প্রাণময় ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহলে আমাদের জীবন মঙ্গলময় হবে। "যে ক্ষমতা মানুষকে সঠিকভাবে চলতে বাধ্য করে তাই ঈশ্বর। প্রাণময় সমস্ত বস্তুর সারই হল ঈশ্বর।"

গান্ধীজীর শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হল ঈশ্বরে বিশ্বাস। তিনি অনুভব করতেন যে তিনি ঈশ্বরের হাতের একটি ছোট যন্ত্র মাত্র, এবং একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কি ভাবে এবং কেমন করে তাঁকে দিয়ে কি কাজ কতখানি করিয়ে নেবেন। যতই তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন ততই ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস উজ্জ্বল এবং দৃঢ়তর হয়েছে। তিনি বলেছেন, "এমন কখনো হয়নি যে তাঁকে ডেকে আমি সাড়া পাইনি। যখন দিগন্ত সবচেয়ে ঘন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে বলে মনে হয়েছে, আমার কারাবাসের কষ্টের সময়, যখন আমার সমস্ত কিছু ঠিক

মত চলছে না তখন আমি তাঁকে পেয়েছি আমার নাগালের ভেতর, সবচেয়ে কাছাকাছি। আমার জীবনের একটি মুহূর্তের কথাও মনে পড়ে না যখন আমার মনে হয়েছে ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।”

সত্য এবং অহিংসা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গান্ধীজীর দুটি মূল শিক্ষা, সত্য এবং অহিংসা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাঁর চিন্তায়, কথায় এবং কাজে এগুলি পূর্ণরূপ পেয়েছে। সত্যের প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত ভক্তি কেবলমাত্র ঘোষণায় শেষ হয়ে যায় নি। তিনি সবচেয়ে আন্তরিকভাবে এটি সম্পর্কে চিন্তা করেছেন এবং তিনি একমাত্র ভগবানের প্রতি ভক্তি রেখে কাজ করে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে, এবং পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেছেন, সত্য-ই ভগবান। যদিও তাঁর দেশের প্রতি ভক্তি একেবারে সম্পূর্ণ ছিল তবু তিনি সত্যকে বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা চাননি। “সত্যকে বর্জন করে স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে ভারতবর্ষের মৃত্যু হওয়া আমার কাছে অধিকতর বাঞ্ছনীয়।”

সত্য এবং অহিংসা একত্রীভূত “এরা হল যেন একটি মুদ্রার দুটি দিক, কিংবা একটা কোনোকিছু উৎকীর্ণ না করা মসৃণ ধাতব পাত।” “সত্যকে যিনি অনুসন্ধান করেন তাঁকে অহিংসার পথে যেতেই হবে, ঠিক যেমন সত্যকে যথাযথভাবে না আঁকড়ে ধরলে অহিংসাকে পাওয়া সম্ভব নয়। হিংসা নয়, অসত্য নয় কেবলই অহিংসা। সত্য আমাদের সত্তাকে চালনা করে। সুতরাং পরম সত্যকে পেতে হলে, প্রত্যেকের উচিত তার

জ্ঞাতসারে অহিংসাকে গ্রহণ করা (এটি আমাদের ভেতরই রয়েছে)। আমি গত পঞ্চাশ বছর ধরে বলে আসছি যে এই আইন জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সেই অনুসারে কাজ করা উচিত।" গান্ধীজীর কাছে অহিংসার অর্থ কেবলমাত্র আঘাত না করা নয়। বিশ্বপ্রেমের আইন—এটি একটি বাস্তব সত্য।

ব্যক্তির পক্ষেই হ'ক বা জাতির পক্ষেই হ'ক অহিংসাকে পুরোপুরি ভাবে মেনে চললে তবেই তাদের মুক্তি হবে। অহিংসা কেবল ঋষি বা সাধুদের জন্য নয়, সাধারণ লোকের জন্যও।

এই ধর্মকে তিনি একেবারেই মানেন না যিনি মনে করেন যদি লক্ষ্য ভাল হয় তাহলে পথ যেমন তেমন হলেই চলবে। লক্ষ্যের পবিত্রতার সঙ্গে উপায়ের পবিত্রতার কখনো বদল চলে না। গান্ধীজী যে অহিংসা সাফল্যের সঙ্গে প্রচার এবং অনুশীলন করেছেন সমস্ত জীবন ধরে, তার সঙ্গে দুর্বলতা বা অসহায়তার কোনো স্থান ছিল না। সাহসের সর্বোচ্চ চূড়ায় অহিংসার স্থান। এরসঙ্গে কাপুরুষতা কিংবা দুর্বলতার কোনো স্থান নেই। তিনি কাপুরুষতার চাইতে হিংসা পছন্দ করতেন, কেননা, "সহিংস লোক কখনো অহিংস হতে পারে কিন্তু একজন কাপুরুষের তার কোনো আশা নেই।" তাঁর জীবন ও যেসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে এ শিক্ষাই নিতে হবে যে কোন লোকের সঙ্গে শত্রুতা বা তার প্রতি যেন বিরূপতা না থাকে। কোনো ব্যক্তিকেই শত্রু মনে করা উচিত নয়। লোকের মধ্যেকার বিষের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে এবং সে বিষকে নির্মূল করতেই হবে।

গান্ধীজী ব্যক্তিগত নীতিজ্ঞান এবং সমষ্টি বা জাতিগত নীতি-জ্ঞানের ভেতর কোনো প্রভেদ করতেন না। যদি দুজন

ব্যক্তির মধ্যে হিংসাকে খারাপ বলা হয় তাহলে দুটি জাতির মধ্যে কার হিংসা সম পরিমাণে খারাপ। সত্য এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সত্যাগ্রহ সেখানে নিপীড়কের ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়। বিজয় মুহূর্তে পরাজয়ের গ্লানি কিংবা জয়ের গর্বের কোনটিই অনুভূত হয় না।

প্রেম ও কষ্ট সহ্য করার প্রতি গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল সত্যি অতি গভীর। প্রতিপক্ষকে নিজের মতে আনবার সবচেয়ে সুন্দর উপায় হল ভদ্রভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানো, জোর করে নয়। অতএব সত্য প্রচারের সময় তাই অন্যকে শাস্তি দেওয়াটা হবে অন্যায়, কিন্তু আমরা যাতে বিশ্বাস করি তারজন্য নিজেদের কষ্ট ভোগ করা মোটেই অন্যায়জনক নয়। নিজের মতামত সম্পর্কে আন্তরিকতার গ্যারান্টি হল নিজে কষ্ট ভোগ করা। এই উপায়টির মধ্যে একটি আলাদা সুবিধে রয়েছে, সেটা হল যদি আমাদের ভুল হয় তাহলে তা সংশোধন করে নেওয়া যায়। তাই অহিংস পথই হল গণতন্ত্রের পথ।

হিংসার মধ্যে সতিকারের নিরাপত্তা নেই। হিংসার ফলে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা হয় অথবা অধিকতর শক্তিশালী দলের অধীনে থাকতে হয়। অহিংসার ভেতর দিয়ে শক্তি আসে দুঃখ সহ্য করবার ইচ্ছে থেকে, এরসঙ্গে শারীরিক যন্ত্রপাতির কোনো সম্পর্ক নেই। যতই অসহায় বলে মনে হ'ক না কেন, সবচেয়ে ছোট সামাজিক দলের পক্ষেও এটা আয়ত্ত করা সম্ভব। "হিংসার শিক্ষা নিতে গেলে যেমন একজনকে হত্যা করবার কায়দা রপ্ত করতে হয়, তেমনি অহিংসার শিক্ষায় একজনকে মরে যাবার কায়দা শিখতে হয়।" যেখানে যুদ্ধের লক্ষ্য হল প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেওয়া যাতে সে ভয়ে ছোট হয়ে

থাকে, বিজিতের ইচ্ছে মত তাকে কাজ করতে হয়, আর সত্যাগ্রহের লক্ষ্য হল যে ভুলপথে চলে তাকে আরো ন্যায়পূর্ণ নতুন নিয়মবদ্ধ সমাজ সৃষ্টিতে তার সাহায্য গ্রহণ করার জন্য দলে টেনে আনা।" অহিংস যুদ্ধের শেষ হয় সব সময়ে দু' পক্ষের একমত হওয়ায়, কখনো প্রতিপক্ষের কোনও আদেশ কিংবা অপমান সহ্য করতে হয় না"। যারা অহিংসার সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে পারে এবং সেগুলিকে পালন করবার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে চেষ্টা করে যেতে পারে তারা সবাই অহিংস সৈন্যদলে নাম লেখাতে পারে। "কখনোই সম্পূর্ণ অহিংস লোক দিয়ে কোনো সৈন্যদল গঠিত হতে পারে না, এই সৈন্যদল যারা অহিংসা পালন করবার জন্য সাহসের সঙ্গে চেষ্টা করবে কেবল তাদের দিয়েই গঠিত হবে।"

গান্ধীজী যে সমস্ত সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেছিলেন সেগুলিতে তিনি বিরাট দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য নরনারীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা ও অহিংস হবার শিক্ষা দেওয়া খুব সহজসাধ্য ছিল না। "কিন্তু তবু তারা যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তা আশ্চর্যজনক।"

সত্য এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহ এইজন্য অভিনব যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে এত বিশাল আকারের আন্দোলন মানব ইতিহাসে এই প্রথম। এত বড় একটা পরীক্ষার মধ্যে কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো সময়ে ছন্দ পতন অনিবার্য ছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অহিংস পরীক্ষা অকৃতকার্য হয়েছে এবং এটা পরিত্যাগ করা উচিত।

বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ

তৃতীয় অধ্যায়টি—বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ এর আকর্ষণের কারণ এটি প্রধানত আত্মজীবনীমূলক আলোচনা। "আমার জীবন

সম্পূর্ণ এবং অবিভাজ্য এবং আমার সমস্ত কার্যকলাপ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর সেগুলি সমস্তই আমার মানব জাতির প্রতি অতৃপ্ত প্রেম থেকে উৎসারিত।" সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীকে নিজের মত ভালবাসাকে গান্ধীজী একমাত্র দেবতাদের কাজ বলে মনে করতেন না, বা নিজেকেও মহাপুরুষ বলে মনে করতেন না। তিনি ছিলেন কেবল "একজন ক্ষুদ্র সত্য সন্ধানী—সত্যকে খুঁজে বার করতেই হবে এই আমার জেদ।" তাঁর জীবন ছিল সত্যকে খুঁজে পাবার জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন সাধনা—মানুষের সঙ্গে মেলায় মেশায় যে সত্য সেই সত্যের তিনি সাধক ছিলেন, কাল্পনিক কোনো সত্য নয়। "এবং আমার এই অনুসন্ধানে আমার সঙ্গী অনুসন্ধানীদের সমস্ত কথাই খুলে বলি যাতে আমি আমার ভুল বুঝতে পারি এবং তা সংশোধন করতে পারি।"

এটা ছিল ধীরগতিতে উপরে ওঠা—প্রতিটি পদক্ষেপে দৃষ্টি আরো সম্প্রসারিত হচ্ছিল, অবশেষে তাঁকে অতিমানব বলে মনে হচ্ছিল। যদি তাঁর উদাহরণ এবং নীতি লক্ষ লক্ষ নরনারীকে প্রেরণা দিয়ে থাকে তবে তার কারণ তাঁর জীবনটা ছিল একটা খোলা বই এর মত। তাঁর কোনোকিছু গোপন করবার ছিল না, এবং তিনি গোপনীয়তাকে মোটেই উৎসাহ দিতেন না।

সত্যের জন্য উদগ্র বাসনা তাঁর জীবনে চলবার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল, আর তা বহু মানুষের হৃদয় ও মনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করত। তাঁর এই বাসনা থাকার ফলে উপায়ের পবিত্রতার উপর ছিল তাঁর প্রচণ্ড জেদ, এবং পূর্বস্থিরীকৃত লক্ষ্য থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। ঐ একই বাসনার ফলে

তিনি জনসমক্ষে তা হিমালয়ের মত বড় কিংবা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রই হ'ক তাঁর ভুল স্বীকার করতেন।

এই ধরনের মিথ্যা হল অবিচার। "ঐ কারণে সত্যের প্রতি ভক্তি আমাকে রাজনীতির পথে টেনে নিয়ে গেছে। আর একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি যে যাঁরা বলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই তাঁরা রাজনীতির অর্থই জানেন না।"

গান্ধীজীর পক্ষে তাই ধর্ম এবং ন্যায়পরায়ণতা একই জিনিস। এটাই স্বাভাবিক, কেননা গান্ধীজী আসলে ছিলেন কর্মযোগী, একজন কাজের মানুষ। জীবনের অন্যান্য কর্ম থেকে ধর্মকর্মকে আলাদা করে দেখা চলে না।

সমস্ত ধর্মের আত্মাই এক

অন্যের ধর্মের প্রতি নিজের ধর্মের যত শ্রদ্ধাবান হওয়া অপরিহার্য, কেননা, "ধর্ম মানুষে মানুষে প্রভেদ সৃষ্টি করবার জন্য নয়, মানুষকে এক করাই তার উদ্দেশ্য।" এই হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়ের বক্তব্য। গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন, "সত্য কোনো বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া বস্তু নয়।"

গান্ধীজীর হিন্দুত্বের ভিত্তি ছিল রামায়ণের নীতি, উপনিষদ এবং ভগবদ্‌গীতার অন্তর্দৃষ্টি। তিনি তাঁর জীবনকে এই সব বুনিয়াদি শিক্ষার ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভাল কাজের ফলে মন পবিত্র হয় আর ভগবান প্রত্যক্ষ করবার দৃষ্টি জন্মায়। "আমি মানবতার সেবার ভেতর দিয়ে ভগবানকে দেখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, কারণ আমি জানি ভগবান আকাশেও নেই, পাতালেও নেই—ভগবান আছেন প্রত্যেকের ভেতর।"

গান্ধীজী আসলে হিন্দু হলেও তিনি অন্যান্য ধর্ম পুস্তক শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন। যীশুখৃষ্টের পর্বতের উপর থেকে দেওয়া মহান নৈতিক উপদেশ, ইসলামের ভ্রাতৃভাবের মূলনীতি তাঁর জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বুদ্ধধর্মের প্রেম, ভদ্রতা এবং শান্তির বাণী।

বারংবার তিনি সমস্ত ধর্মের বিশ্বজনিনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর নিজের জীবনে তা অনুশীলন করে তার সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

এটা তাই স্বাভাবিক যে "ধর্মান্তরণ" তাঁর কাছে ঘৃণ্য ছিল। তার বদলে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "আমি একজন হিন্দুকে আরো ভালো হিন্দু হতে, একজন মুসলমানকে আরো ভালো মুসলমান হতে এবং একজন খৃষ্টানকে আরো ভালো খৃষ্টান হতে সাহায্য করব। আমাদের ভেতর থেকে এই গোপন গর্ব মুছে ফেলবার চেষ্টা করব যে আমাদের ধর্ম বেশি সত্য অন্যদের ধর্ম কম। অন্য সমস্ত ধর্মের প্রতি আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং আন্তরিক হওয়া উচিত।"

গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন ধর্মের সার এবং আত্মা হল প্রার্থনা অতএব মানুষের জীবনের অন্তরতম স্থানে এর অবস্থান, কেননা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে—নিয়মানুবর্তিতা এবং ছন্দ আনতে গেলে প্রার্থনার একান্ত প্রয়োজন।

দরিদ্র নারায়ণ

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম দরিদ্র নারায়ণ, এই অধ্যায়ের মূল ভাব হল দরিদ্রদের এবং নিপীড়িত লোকজনদের প্রতি গান্ধীজীর উদ্বেগ এবং তাদের অবস্থাকে কেমন করে ভাল করা যায় সে সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ

দান। কষ্ট নিপীড়িত মানুষদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল কিন্তু তাতে মুরুব্বিয়ানাও ছিলনা, ভাবপ্রবণতা ও নয়। তিনি তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে তিনি তাদের জন্য সর্বদা চিন্তা ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেন।

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে মানুষের বেশির ভাগের যে অভাব তা অপরিহার্য নয়। যাঁরা ধন উৎপাদন করেন তাঁদের উচিত তা সমভাবে বণ্টন করা, এটাই ছিল তাঁর আদর্শ। খাদ্য, বস্ত্র এবং মাথার উপরে ছাদ এগুলি থেকে কোনো কৃষক বা শ্রমিককে বঞ্চিত করা চলবে না। সাধারণ লোকের জন্য এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির ব্যবস্থা করতেই হবে।

তিনি যে কোনো রকম শোষণেরই বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর চতুর্দিকে যে অর্থনৈতিক অসাম্য এবং সামাজিক অবিচার দেখেছিলেন তা দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে দেশী বা বিদেশী ধনতন্ত্রবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেহেতু তিনি ছিলেন অহিংসার দৃঢ় বিশ্বাসী সেহেতু তিনি পুঁজিবাদীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার বিরোধী ছিলেন। তবু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শোষণ বন্ধ করতেই হবে। যদি পুঁজিবাদীরা শ্রমিকদের অছিরূপে কাজ করেন তবেই তা সম্ভব। তাঁর মতে শ্রমিকেরা, "মিলের শেয়ার হোল্ডাররা যতখানি মালিক, তারাও ততখানিই মালিক, আর যখন মিল মালিকেরা বুঝতে পারবেন যে মিলের শ্রমিকেরা তাঁদেরই মত মালিক, তখন আর এই দুই দলে বিবাদ হবে না।" তিনি এই দু'দলের মধ্যে সমান মর্যাদা আনবার চেষ্টা করেছিলেন। শত শত বছর ধরে শ্রমিক শ্রেণীকে আলাদা করে রাখা হয়েছে, তাদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কম। তাদের বোঝা

উচিত যে শ্রমও মূলধন। যখনি শ্রমিকেরা ঠিকমত শিক্ষা লাভ করবে, নিজেদের দল গঠন করবে আর তারা যখন নিজেদের শক্তিকে উপলব্ধি করবে, কোন রকম মূলধনই তাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।" তিনি অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে তা বলে ধনিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের প্রয়োজন নেই, কেননা একের নইলে অন্যের চলেনা। যা প্রয়োজনীয় তাহল "পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের উপর সর্দারি করবে না।" যদি ধনী পুঁজিপতিরা অছি না হয়ে দরিদ্র শ্রমিকদের শোষণ করতেই থাকে তাহলে কি হবে? সঠিক এবং নির্ভুল উত্তর হল, সত্যাগ্রহ। অহিংস উপায়ে পুঁজিপতিরা ধ্বংস হবে না, ধ্বংস হবে পুঁজিবাদ কারণ পুঁজিপতিরা সেক্ষেত্রে নিজেদের মনে করবেন সেই সমস্ত শ্রমিকদের অছি, যাদের উপর নির্ভর করে ধন সৃষ্টি, ধনরক্ষা এবং ধনবৃদ্ধি। গান্ধীজির বিশ্বাস ছিল "দান" এর ফলে দাতা এবং গ্রহণকারী এই উভয়েরই সম্মানহানি ঘটে। কলকব্জা বলেই গান্ধীজী সেগুলোর যে বিরোধিতা করতেন তা নয়। তিনি বিরোধিতা করতেন কলকব্জার জন্য ক্ষেপে ওঠা"কে। তিনি বলেছিলেন, সমস্ত লোকের উপকারে লাগে যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সে সমস্তই আমি মূল্যবান বলে মনে করি।" কিন্তু তিনি সেই সমস্ত কলকব্জার বিরোধিতা করতেন যেগুলো শ্রমিককে কর্মচ্যুত করে, কলকব্জা নির্বিচারে বহুগুণ উৎপাদন বাড়ায়, এবং মাত্র কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। তিনি "কলকব্জার আপাত বিজয়"এর দ্বারা প্রলোভিত হতে অস্বীকার করতেন।

তিনি অবশ্য "জনসাধারণের উপকারে লাগে, মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব নয় এমন ভারি যন্ত্রপাতি"র প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। নিজে সমাজবাদী বলে তিনি এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন যে এই সমস্ত বড় বড় কারখানায় যেখানে প্রচুর লোককে

কাজ করতে হয় সেগুলিকে জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ করা কর্ত্তব্য। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাদের কাজ করা উচিত।

"ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে কাজ করে খেতে পারে, এবং ভগবান বলেছেন যারা কাজ না করে খায় তারা চোর।" রাস্কিনের লেখা, 'আনটু দিস লাস্ট' বইটা পড়ে গান্ধীজীর যে ধারণা হয়েছিল টলস্টয়ের রুটিশ্রম সম্পর্কে রচনায় তার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে আরো সমর্থন পান, তাতে লেখা আছে, যে ত্যাগ স্বীকার না করে খায় সে চুরি করা জিনিস খায়। গান্ধীজী 'ত্যাগ স্বীকার' এর অর্থ করেছেন শারীরিক শ্রম বা রুটিশ্রম। সমস্ত মানুষ, তা তাদের বিশেষ ক্ষমতা যাই থাকুক না কেন, তাদের রুটিশ্রমের নিয়মে চলতেই হবে। জীবনের এটাই নিয়ম এবং ব্যক্তির স্বাস্থ্য, সুখ এবং তৃপ্তির পক্ষে এটাই প্রয়োজনীয়। তিনি এই আইন না মানার জন্য বর্তমানের বহু সামাজিক গলদ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন।

এটা বলা যায় যে কোটি কোটি লোকের পক্ষে তাদের জীবনের অর্থ দাঁড়িয়েছে কেবলমাত্র কষ্ট এবং প্রায় উপবাস। এরকম হয়ে দাঁড়াবার আসল কারণ হচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় রুটিশ্রম আইনটিকে মেনে নেয়নি।" বাধ্য হয়ে রুটিশ্রম আইনকে মেনে নিতে হলে সৃষ্টি হয় অভাবের, অসুখ এবং অতৃপ্তির। এটা ক্রীতদাসত্বের এক রূপ। খুসি হয়ে এই আইন মেনে চললে তৃপ্তি এবং স্বাস্থ্য লাভ হয়।" জগতের কেউ এমনকি একজন কোটিপতিও, শারীরিক শ্রম না করে বেঁচে থাকতে পারে না।" যদি প্রত্যেকে, দরিদ্র বা ধনী, কোনো না কোনো উপায়ে শারীরিক শ্রম করেন, তাহলে প্রত্যেকেই লাভজনক ভাবে, অর্থাৎ কিনা রুটিশ্রম করেন না কেন?" কথায় এবং কাজে তিনি শ্রমের মর্যাদার উপর জোর দিয়েছেন।

সমাজের কাজে লাগে এমন কোন শ্রমকেই তিনি হেয় মনে করেন নি।

দেশের মঙ্গলের জন্য

যদিও গান্ধীজী সমগ্র মানবতার মঙ্গলের কথা ভেবেছেন, তবুও জন্মভূমির প্রতি ছিল তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে প্রিয় ছিল কেননা বহু যুগ ধরে কোনো না কোনো চিরন্তন সত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে ভারতবর্ষ। এই মূল সুর ষষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যে প্রবাহিত। এই মূল সুরের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরো ছোট ছোট ভাগ করে।

ভারতবর্ষের ঐক্য

গান্ধীজী এই দেশে বিরাট ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যাঁরা এখানে বাস করেন, তাঁদের যে ধর্মই হ'ক না কেন, তাঁরা এই সর্বসাধারণের বাসগৃহে সমানভাবে থাকবার এবং ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তাঁদের রয়েছেসমান অধিকার এবং দায়িত্ব। ধর্ম হচ্ছে মানুষ এবং ভগবানের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। "জাতীয়তার বিচারে যে ধর্মের লোকই হন না কেন, তাঁরা পুরোপুরিভাবে ভারতীয়।" তাঁর মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমরা তাঁর বিশাল হৃদয়, সহনশীলতা এবং ঐক্যের বাণী পেয়েছি।

তিনি সাবধান করে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিকে নতুন করে ভাষাভিত্তিক ভাবে গঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার জৈবিক ঐক্য ভেঙে না যায়। "যদি প্রতিটি প্রদেশ নিজেদের একটা পৃথক, সার্বভৌম, সম্পূর্ণ একক মনে করে তাহলে ভারতবর্ষ

তার স্বাধীনতার অর্থ হারিয়ে ফেলবে, এবং এর নানা এককেরও স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে।" বাইরের জগত আমাদের গুজরাতী, মারাঠী, তামিলভাষী ইত্যাদি বলে জানেনা, জানে ভারতীয় বলে। "আমরা অতএব খুব জোরের সঙ্গে সমস্ত রকম বিভেদ মুক্ত হয়ে নিজেদের ভারতীয় বলে অনুভব করব এবং সেইভাবে ব্যবহার করব।" তিনি সুস্থ একরকম প্রাদেশিকতাকে সমর্থন করতেন, তা নইলে আলাদা আলাদা প্রদেশ রাখবার কোনো অর্থ হয় না।" "তবে আমাদের প্রাদেশিকতা কখনো ক্ষুদ্র বা একচেটিয়া হবে না। এটা হবে সমস্ত দেশেরই স্বার্থে, প্রদেশগুলো যে দেশেরই অংশ। প্রদেশ যাই করুক না কেন তা যেন সমগ্র দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে।

তাঁর স্বপ্নের ভারত

কোটি কোটি লোকের অভাব এবং হীন জীবন যাপন দেখে তাঁর প্রচণ্ড দুঃখ হয়েছিল এবং তিনি তাদের উন্নতির জন্য তাঁর শক্তির প্রতিটি বিন্দু খরচ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই দেশের ৪০ কোটি লোকের প্রতিজন যাতে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পারে, তারা যাতে ভারতবর্ষে জীবনের প্রয়োজনীয় সুযোগ এবং আশীর্বাদ সমান ভাবে পায়।

গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ভারতবর্ষকে তার ছোট বড় শহরে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে তার সাত লক্ষ গ্রামে। ভারতীয় কৃষিজীবীদের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস ; তিনি তাঁদের পৃথিবীর সবচেয়ে প্র[illegible] বস্তু এবং গণতন্ত্রের নঙ্গর বলে মনে করতেন। দ্রুতগতি[illegible] বড় শহর গড়ে ওঠাকে গান্ধীজী অপ্রসন্নতার সঙ্গে দেখতেন, তিনি মনে করতেন এগুলো হল বর্তমান

সময়ের অস্বাস্থ্যকরতা। শহরগুলো গ্রামগুলিকে শোষণ করায় এবং শহরে বুদ্ধিজীবীদের সরল গ্রামবাসীদের উপর সর্দারি করায় বা তাদের হেয় ভাবায় তিনি বিশেষ ব্যথিত হতেন। তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে যদি ভারতকে সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে হয় তাহলে এটা জানা কর্তব্য যে জনসাধারণকে গ্রামেই থাকতে হবে শহরে নয়, কুটিরে, প্রাসাদে নয়। "কোটি কোটি লোক শহরে বা প্রাসাদে শান্তিতে বাস করতে পারবে না। বাস করলে হিংসা এবং মিথ্যাকে তারা ত্যাগ করতে পারব না।" সত্য এবং অহিংসা তখনই পাওয়া সম্ভব যখন লোকেরা গ্রামের সরল জীবন যাপন করবে।

গান্ধীজীর মতে, আমাদের এই দেশের বিরাটত্ব, এর বিপুল লোকসংখ্যা, এর ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এই দেশকে গ্রাম্য সভ্যতার জন্যই প্রস্তুত করেছে। বর্তমানে এই সভ্যতার নানা ত্রুটি আছে, তবে সর্বপ্রচেষ্টার ফলে সেগুলোকে ত্রুটি মুক্ত করা যায়। যে সমস্ত ত্রুটি আমাদের জানা আছে সেগুলিকে দূর করবার জন্য ক্রমশ শিক্ষিত যুবকবৃন্দের গ্রামে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা উচিত এবং গ্রামবাসীদের "অর্থ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়" সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বহু বছর ধরে আমরা তাদের শোষণ করে এসেছি। ফলে গ্রামগুলোতে পচন ধরেছে। "প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিকের কাজ হল এই পচন রোধ করা, অথবা অন্য কথায়, ভারতবর্ষের গ্রামগুলোকে কিভাবে পুনর্গঠন করা যায় যাতে প্রত্যেকের পক্ষে সেখানে বাস করা সহজ হয়।"

তিনি দুঃখ পেতেন এটা ভেবে যে [illegible] কি গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা শহরে জীবনের [illegible] সামলাতে পারছেন না, এবং সেখানে গিয়ে ভিড় করছেন। অতএব তিনি গ্রামীন শিল্পের

এবং কলার পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষভাবে মন দিয়েছিলেন, যাতে গ্রামগুলি স্বয়ংনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। গ্রামবাসীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির জন্য গ্রামের উপরই নির্ভর করতে শিখবেন, শহরের উপর নয়।

ভারতবর্ষের শহরে যে ঐশ্বর্য চোখে পড়ে তা দরিদ্র ভারতবাসীর রক্ত দিয়ে তৈরি। "আমি নিজে গ্রামবাসী, তাই গ্রামের অবস্থার খবর আমি রাখি। আমি গ্রামীন অর্থনীতি কাকে বলে জানি। আমি আপনাদের বলি, উঁচু থেকে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা তলাকার লোকদের চেপে থেঁতলে দেয়। যা প্রয়োজন তা হল তাদের পিঠ থেকে নেমে পড়া।"

তাই তিনি খাদি এবং চরকাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। কেউ কেউ চরকাকে টাকা উপায়ের একটা হাস্যকর কল বলে মনে করতে পারেন। এটা অবশ্যই হাস্যকর বলে মনে হত যদি গান্ধীজী কেবল চরকাকেই ভারতীয় গ্রামবাসীদের একমাত্র জীবনধারণের উপায় বলে মনে করতেন। তিনি কখনো সেরকম কথা বলেননি। সূতো কাটাকে কৃষির একটি অংশ হিসেবে, যে শিল্প সকলের পক্ষেই সহজসাধ্য ছিল, যা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল সেই রকম অবস্থায় তিনি তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে কৃষি কর্মের অবসরে গ্রামবাসীরা এর চর্চা করতে পারে। গান্ধীজী বলেছিলেন, চরকার সাহায্যে গ্রামবাসীদের যা সামান্য আয় তার উপর কিছু বেশি আয় করা এবং তাদের পোশাকের খরচেও কিছুটা সাশ্রয় করা সম্ভব।

ইংরেজেরা আসবার আগে এবং এসে ধ্বংস করার আগে আমাদের দেশে সূতো কাটা শিল্পের খুব প্রসার ঘটছিল। গান্ধীজী কেবল সেটাকে আবার চালু করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী এটাকে

একটা প্রাচীন বিস্মৃত শিল্প মনে করতেন না, তিনি এটাকে পরিণত, কার্যকর এবং সহজে করা যায় এমন একটা জিনিস যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক কিছু বেশি আয় করতে এবং সেই সঙ্গে এদেশ থেকে যে টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে তার পরিমাণ কমাতে পারে বলে মনে করতেন।

"খাদি আমার কাছে ভারতীয় মানবতার ঐক্যের, এর অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার, সাম্যের—এবং তাই শেষ পর্যন্ত জওহরলাল নেহরুর কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, 'ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীর ভাণ্ডার'।"

গণতন্ত্র

সত্যিকার স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে আমাদের স্বেচ্ছামূলক ভাবে নিয়মানুবর্তিতা পালন করার রহস্য জানতে হবে। "সংঘবদ্ধ স্বাধীনতার প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিস হল স্বেচ্ছামূলক নিয়মানুবর্তিতা।" নিয়মানুবর্তিতা, সহনশীলতা এবং পরস্পরের প্রতি ভক্তি ছাড়া গণতান্ত্রিক জীবন যাপন সম্ভব নয়। "সবচেয়ে বড় স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সবচেয়ে বড় নিয়মানুবর্তিতা এবং বিনয়।"

"জন্মগতভাবে যিনি গণতান্ত্রিক তিনি জন্মগতভাবে নিয়মানুবর্তী।"

গান্ধীজী ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মূল্য দিতেন, কিন্তু মানুষ প্রধানত সামাজিক বলে তাকে খুব সাবধানে সেই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করা উচিত। ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া হল সম্পূর্ণরূপে অগণতান্ত্রিক এবং অন্যায়। "স্বাধীনতার ধ্বংস আসে ঐ পথেই।"

আমরা যদি সত্যিকারের গণতন্ত্রের চর্চা করতে চাই তাহলে আমাদের অসহনশীল হলে চলবে না। অসহনশীলতা নিজের কর্মের প্রতি অবিশ্বাস প্রমাণ করে।" এটা হল হিংসার একটা রূপ এবং সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধির অন্তরায়। বিরোধীদের বক্তব্য শুনবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। যদিও আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী নির্ভীকভাবে কাজ করা উচিত, তবু "আমরা সর্বদাই মনটাকে খোলা রাখব এবং সর্বদাই এটা ভাববার জন্য প্রস্তুত থাকব যে আমরা যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলাম, তা ছিল মিথ্যা। মনকে এভাবে খোলা রাখলে আমাদের অন্তরের সত্যকে জোর দেওয়া হয় এবং যদি কোন মলিনতা থাকে তা দূর হয়।" কেউই বলতে পারেন না যে সঠিক বিচার একমাত্র তিনিই করতে পারেন। আমাদের ভুল হয় এবং প্রায়ই আমাদের তা সংশোধন করে নিতে হয় বা আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তকে বদলাতে হয়। ব্যক্তি বা দলের পক্ষে যদিও তাদের সত্যিকারের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সুযোগ থাকা উচিত, তবুও আমাদের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি আমাদের এটা কর্তব্য যে, "আমরা যেন অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝবার চেষ্টা করি, এবং যদি আমাদের পক্ষে তা গ্রহণীয় না হয় তাহলে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে এমন শ্রদ্ধা দেখাই যা আমরা আশাকরি তারা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি দেখাবে।"

গান্ধীজীর মতে সত্যিকারের গণতন্ত্র মিথ্যা এবং হিংস উপায়ে আসতে কখনই পারে না। "গণতন্ত্রের মূলকে কেউ বাইরে থেকে চাপিয়ে দিতে পারে না। অন্তর থেকে তাকে আসতেই হবে।"

গণতন্ত্রে দুর্বলতম এবং সবলতমের সমান সুযোগ থাকা উচিত। "অহিংসা ছাড়া তা কখনই সম্ভব নয়। আজ পৃথিবীর কোনো দেশ নেই যে দেশ দুর্বলের প্রতি কর্তাগিরি ফলায় না।"

অস্পৃশ্যতা

গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের নাম দিয়েছিলেন হরিজন, তিনি তাঁদের সম্পর্কে গভীরভাবে অনুভব করতেন এবং তাঁদের জন্য তিনি খুব বড় কাজ করে গেছেন। গান্ধীজীর জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতা দূর করা। "আমি যা কামনা করি, আমি যে জন্য বেঁচে আছি আর আমি যার জন্য সানন্দে মৃত্যুবরণ করতে পারি তা হল সমূলে, শাখা প্রশাখা সমেত অস্পৃশ্যতা দূর করা।" তিনি মনে করতেন আমাদের সমাজের সবচেয়ে দুর্বল সময়ে এই বিষ প্রবেশ করেছিল এবং তা আর দূর হয় নি।

যে সমস্ত মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ নিষেধ ছিল সে সমস্ত মন্দিরে তিনি প্রবেশ করতে অস্বীকার করতেন।

নারী

নারীত্বের প্রতি গান্ধীজীর ভক্তি তাঁর চরিত্রের একটি অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। তিনি নারীদের ত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকারের মূর্তি বলে মনে করতেন। "অহিংসা হল অসীম প্রেম, যার আবার অর্থ হল কষ্ট স্বীকারের অসীম ক্ষমতা। মানুষের জননী, নারী ছাড়া আর কে এত কষ্ট স্বীকার করতে পারে?" তিনি মনে করতেন হিন্দু সংস্কৃতি ভুল করেছিল, "স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অতিরিক্ত দাবিয়ে রেখে, এবং স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়ে। এরফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর কর্তৃত্বের আধিক্যে সে পশুর পর্য্যায়ে নেমে গেছে।"

নারীদের অধিকার সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত কখনো আপোষ করে চলেনি তিনি অনুভব করতেন যে আইনগত যে বাধা পুরুষদের

ভোগ করতে হয় না সে বাধা যেন নারীদেরও ভোগ করতে না হয়। পুত্র এবং কন্যাদের যেন সমানভাবে দেখা হয়।

জাতীয় ভাষা

গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে বিদ্যালয় এবং কলেজে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এবং সমস্ত দেশের সাধারণ ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণ করা উচিত। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী, যা কিনা "সরল হিন্দী এবং সরল উর্দু ভাষার মিশ্রণ" সাধারণ লোকের ভাষা হওয়া উচিত এবং সমস্ত ভারতীয়ের পক্ষে আন্তপ্রাদেশিক ভাষা হিসেবে এটাই সবচেয়ে ভাল। "আমাকে যদি একাও চলতে হয় তাহলেও আমি হিন্দুস্থানীকেই আঁকড়ে থাকব।"

ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য

আমাদের মধ্যে ভাল করবার প্রবৃত্তি সব সময়েই রয়েছে কেবল তাকে ঠিক ভাবে সম্প্রসারণ করা আমাদের কর্তব্য। "সবচেয়ে বড় নৈতিক আইন হল এই যে সমগ্র মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যাওয়া।" কথাটা এই সঙ্কলনের সপ্তম অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। জীবনের সবচেয়ে মহান লক্ষ্য হল মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা। এটা জানা উচিত, অন্যের মঙ্গলের সঙ্গে নিজের মঙ্গল সম্পর্কিত। যিনি অন্যের সেবায় জীবন কাটান তাঁর নিজের বা নিজের আরামের কথা ভাববার সময় থাকে না। যদি আমরা এটা জানি যে আমাদের মধ্যেই রয়েছেন ভগবান, আমরা তাহলে এই পৃথিবীতে অন্য যে কোনো ভয় থেকে বিমুক্ত হব—কেবল ভগবানকেই আমরা ভয় পাব।" এই উপলব্ধির ফলে আমরা জীবনের সমস্যাবলীর সম্মুখীন হব বিনয়, তেজ এবং ভয়হীনতার সঙ্গে।

গান্ধীজী অনুভব করতেন যে যদিও কিছু পরিমাণ দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের প্রয়োজনীয়তা আছে, তবুও "দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিগত প্রয়োজনীয়তারও একটা সুনির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত, তা নইলে এরফল দাঁড়ায় দৈহিক এবং মানসিক বিকৃতিতে।"

"মন হল চঞ্চল পাখির মত। যত পায় তত চায়, এবং তাতেও সন্তুষ্ট হয় না।" মানুষের সুখ নিহিত আছে তৃপ্তিতে।

তিনি তাই ব্রহ্মচর্য পালনকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করতেন। তিনি তাকে এভাবে প্রকাশ করেছিলেন "সেই আচরণ যা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায়। সেই আচরণ যা সমস্ত রকম অনুভূতির উপর কর্তৃত্ব করে। এই হল কথাটার সত্য এবং প্রকৃত অর্থ।" তিনি বলেছিলেন সর্বস্ব ত্যাগই হল আদর্শ। "যদি এটা ভাবতে সাহস না হয় তাহলে বিয়ে করুন, ক্ষতি নেই—কিন্তু সেখানেও নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখুন।"

মানব পরিবার

গান্ধীজীর জীবন এবং শিক্ষার মধ্যে রয়েছে একটা বিশ্ব আবেদন। মানুষের নৈতিক চেতনার উপর তাঁর ছিল মুখ্যত ধর্মীয় এবং নৈতিক আবেদন। তিনি ধর্মের দেশ বা জাতির পার্থক্য মানতেন না। তাই তিনি একজন আন্তর্জাতিক মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক ঐক্যের ধারা প্রবাহিত আছে। অষ্টম এবং শেষ অধ্যায়ে গান্ধীজী বলেছেন: "ভগবান আমাকে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পাঠিয়েছেন, আমি যদি তাদের সেবা না করি তাহলে আমি আমার

সৃষ্টিকর্তার কাছে অসত্য বলে প্রতিপন্ন হব। আমি যদি তাদের কি ভাবে সেবা করব তা না জানি তাহলে আমি কখনও মানবতার সেবা করতে পারব না। আর আমি যদি আমার দেশের সেবা করতে গিয়ে অন্য দেশের প্রতি অন্যায় না করি তাহলে আমার কিছুতেই ভুল হতে পারবে না।"

তাঁর অহিংসার দর্শন একজন ব্যক্তির বা দেশের একচেটিয়া বলে তিনি মানতেন না। তিনি ভারতকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষ জগতকে আত্মত্যাগের কৌশল শেখাতে পারবে।

১। কেবল ঈশ্বর আছেন

সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে অবর্ণনীয় এক রহস্যময় শক্তি। তাকে দেখতে পাই না, কিন্তু অনুভব করতে পারি। সে নিজেকে অনুভব করায় কিন্তু প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে। সে যে আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছুর থেকেই পৃথক। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যুক্তিবলে অন্তত কিছুটা প্রমাণ করা যেতে পারে কিন্তু সে সব যুক্তির অতীত।

আমার চারপাশে এই যে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন আর ধ্বংসের লীলা চল্‌ছে—এই সবের মূলে রয়েছে এক সক্রিয় শক্তি, যার কোনও পরিবর্ত্তন নেই—যা এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে সব কিছুকে—যা সৃষ্টি, ও পুনঃসৃষ্টির কারণ। প্রাণসঞ্চারী এই শক্তি বা আত্মাই ঈশ্বর। সুতরাং আমার দৃষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও কিছুই যখন চিরস্থায়ী নয় বা থাকতে পারে না তখন ঈশ্বরই একমাত্র শাশ্বত।

এই শক্তি কি শুভ না অশুভ? কিন্তু যখন আমি দেখতে পাই মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে জীবনের অস্তিত্ব, অসত্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশ আর অন্ধকারের মধ্যে আলো, তখন আমি একে সম্পূর্ণ শুভ বলেই মনে করি। আর আমি এও বুঝতে পেরেছি যে ভগবানই জীবন, সত্য ও আলোক। তিনিই প্রেম ও পরম মঙ্গলময়।

ঈশ্বর অব্যক্ত—সেইজন্য তাঁকে আমরা অনুভব করতে পারি কিন্তু জানতে পারি না। আমার কাছে সত্য ও প্রেমই ঈশ্বর।

তিনিই নীতিবাদ ও ন্যায়ের প্রকাশ। নির্ভীকতাই ঈশ্বর! জীবন ও প্রজ্ঞার উৎস তিনি—তবু তিনি এ সবেরই ঊর্ধে। ঈশ্বরই বিবেক। এমন কি নিরীশ্বরবাদীদের নিরীশ্বরবাদও তিনি। তিনি সকল যুক্তিতর্কের অতীত। যারা তাঁকে সাকাররূপে পেতে চায় তাদের কাছে তিনি সেইরূপেই প্রতিভাত হন। যারা তাঁর পরশ চায়, তাদের মধ্যেই তিনি বিরাজ করেন। তিনিই সারাৎসার। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। সকলের সব দাবী তিনিই পূরণ করেন। আমাদের মধ্যে থেকেও তিনি যেন আমাদের থেকে বহু দূরে। অনেক দুঃখে তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি ধীর, আবার ভয়ঙ্করও তিনি। তাঁর কাছে অজ্ঞানতার কোনও ক্ষমা নেই। তিনি ক্ষমাশীলও, কারণ তিনি সব সময় আমাদের অনুতাপ করবার সুযোগ দেন। আমাদের সকলকেই তিনি ভালো মন্দ বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছেন—সেইজন্য সবাই তাঁকে সমদর্শী বলে জানে। নিদারুণ অত্যাচারী তিনি। আমাদের সামনে থেকে সুখের পাত্র ছিনিয়ে নিয়ে অতি সঙ্কটময় অবস্থায় ফেলে দিয়ে তিনি স্বয়ং আনন্দ উপভোগ করেন। সেইজন্য হিন্দুধর্মে এই সবই তাঁর লীলা বলা হয়।

ঈশ্বর যদি তাঁরই সৃষ্ট জীবের প্রমাণসাপেক্ষ হন, তবে তিনি আর ঈশ্বর থাকবেন না। যারা তাঁর অনুগত, তাদের তিনি সমস্ত সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার সুযোগ দেন। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী আমি এই শক্তিমান প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রেখেছি। একটা করে বছর যাচ্ছে, তাঁর স্বরও ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে। আমার অতি দুঃসময়েও তিনি আমাকে ত্যাগ করেন নি। আমি ভুলপথে চালিত হলে সেই আমিত্ব থেকে আমাকে তিনি রক্ষা করেছেন। তখন সম্পূর্ণ তাঁরই অধীনে আমি কাজ করছি। যতই আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার আনন্দও তত পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যার থেকে আপনারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু আমি এই ধরনের যুক্তিপূর্ণ কোনও ব্যাখ্যা করে আপনাদের বুদ্ধিমত্তার অবমাননা করতে চাই না। সমস্ত যুক্তি সরিয়ে রেখে শিশুর মত সরল বিশ্বাসে আমি বলছি—আমার অস্তিত্ব থাকলে তিনিও আছেন। আমার এই অস্তিত্ব তাঁর ওপরই নির্ভরশীল। অন্য সকলের অস্তিত্বও তাই।

যে একবার সাঁতার শিখেছে, তা সে কখনও ভোলে না, তেমনই একবার যে ঈশ্বরের স্বর শুনেছে, সেই স্বর সে কখনও ভুলতে পারে না। এই শ্রুতি মানুষকে নিত্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তোলে।

যোগ্য লোকই এই স্বর শুনতে পায়। ধৈর্য্য ধরে অবিরাম চেষ্টায় ঈশ্বরের অপেক্ষা করে থাকলে এই যোগ্যতা আসে। শঙ্করাচার্য তৃণের অগ্রভাগের মত ছোট্ট এক যন্ত্র দিয়ে সমুদ্রকে নিঃশেষ করতে গেলে যে চেষ্টা করতে হয়, তারসঙ্গে এই চেষ্টার তুলনা করেছেন। এই কাজের কোনো শেষ নেই, জন্ম জন্মান্তর ধরে এই কাজ চলতে থাকবে। আমাদের অজান্তে আমরা শ্বাস ফেলি—আমাদের চোখের নিমেষ পড়ে—তবু তা স্বাভাবিক। জীবনের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। এই অবিরত চেষ্টাতেই আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে পারি—সেইজন্যই এই উপায়টির কথা আপনাদের জানানো হল।

আমাদের এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। একশ বছর আয়ুও অনন্ত-কালের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু যদি আমরা অহংবোধের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে মানবতা সাগরে বিলীন হই, তবে আমরা জীবনে সামান্যতম গৌরবও পেতে পারি। অহংবোধ থাকলে ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকে। এই অহংভাব যদি আমরা

ত্যাগ করতে পারি, তা হলেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হব। সমুদ্রের একবিন্দু জলও সমুদ্রের গৌরব পায়, সেই জলকণা কিন্তু সে সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। সমুদ্রের থেকে পৃথক হলে সেই জলকণা শুকিয়ে যায়। জীবন বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র—আমাদের এই কথা অতিশয়োক্তি নয়।

নম্রতার সঙ্গে মানুষের সেবা করা উচিত। পরার্থে যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে, নিজের বলতে তার আর কিছুই থাকে না। নিষ্ক্রিয়তাকে আমরা যেন নম্রতা বলে ভুল না করি। হিন্দুধর্মে আমরা তাই দেখি। মানুষের সেবার জন্য উদ্যমের সঙ্গে অবিরাম চেষ্টা করাকেই প্রকৃত নম্রতা বলা যায়। ঈশ্বরের মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম নেই, সর্বক্ষণই তিনি কাজ করে চলেছেন। ঈশ্বরের সেবা করতে চাইলে বা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে চাইলে আমাদের তাঁরই মত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। সমুদ্রের থেকে যে জলবিন্দু পৃথক, মুহূর্তের বিশ্রাম সে পায়। কিন্তু যে জলবিন্দু সমুদ্রের মধ্যেই বিলীন হয়ে আছে, ক্ষণকালের জন্যও তার বিশ্রাম নেই। আমাদের পক্ষেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যদি একাত্ম হই, তাহলে সমুদ্রের ঐ জলবিন্দুর মত আমাদের মুহূর্তকাল অবসর থাকে না, আর তখন আমাদের বিশ্রামের কোনও প্রয়োজনই হয় না। আমাদের নিদ্রাও তখন কাজবিশেষ। কারণ সেই সময়েও ঈশ্বর চিন্তায় আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন থাকে। এই বিশ্রামহীনতাই প্রকৃত বিশ্রাম। এই সীমাহীন আকুলতাই অবর্ণনীয় শান্তির পথ। নিঃশেষে আত্মসমর্পণের এই চরম অবস্থা বর্ণনার অতীত—কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। অনেক উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে আর আমরাও তা লাভ করতে পারি।

নিজেকে জানাই জীবনের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে আমরা নিজেদের জানতে পারি না। ঈশ্বর জ্ঞানই

জীবনের সারমর্ম। ঈশ্বরকে জানার প্রয়োজন আমাদের সকলেরই। অসীম, নিঃস্বার্থ সেবা এই জ্ঞানলাভের উপায়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সামান্য তৃণের অগ্রভাগ পর্যন্ত তাঁরই ইচ্ছায় চালিত হয়।

মন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও যুক্তিপূর্ণ ধারণা আমার নেই। তা করতে পারলে আমি তো ঈশ্বরের মতই হতাম। আমি বিনীত-ভাবে মন্দ সম্বন্ধে আমার ধারণা জানাচ্ছি। ঈশ্বর দুঃখের অনুভূতির মধ্যেই—তিনি ধীরও। তিনি পৃথিবীতে সমস্ত রকম মন্দকে অনুমোদন করেন। তাঁরমধ্যে মন্দের কোনো স্থান নেই। মন্দ যা কিছু সবেরই তিনি স্রষ্টা—তবু মন্দ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

প্রাণ দিয়েও মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। আমার তুচ্ছ ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই বিশ্বাসে দৃঢ়। আমি নিজেকে যত পবিত্র করে তুলতে পারছি, ততই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পোঁছতে পারছি। আমার বিশ্বাস যখন আজকের মত শুধু মুখের কথাই থাকবে না, যখন তা হিমালয়ের মত অচল ও তুষারশৃঙ্গের মত শুভ্র ও উজ্জ্বল হবে, তখন আমি ঈশ্বরের নিকটতম হতে পারবো। কবি নিউম্যান-এর কথায় বলা যায়—"চারদিকে ঘনায়মান অন্ধকার থেকে, আলোক আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আঁধার রাতে পথহারা আমি। আমাকে একটিমাত্র কর্তব্য কর্মের নির্দেশ দাও, তার থেকেই আমি আগামী দিনের কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে পারবো।"

ঈশ্বর সকলের মধ্যেই কাজের অনুপ্রেরণা দেন ও বারংবার সকলকে দিয়ে চেষ্টা করান। বিশ্বাস যখন হারিয়ে যায় ও শরীর

কাজে অশক্ত হয়, যখন মনে হয় নিজেদেরকে চালনা করা যাচ্ছে না সেই সময়ে যে কোনও উপায়ে তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে কোনো কারণেই তাঁর ওপর বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। নিজের নির্দেশে না চলে তাঁরই নির্দেশে চললে তিনি সব সময় সকলের আহ্বানে সাড়া দেন।

ঈশ্বর মহান ও দয়ালু। তাঁর সেবককে তিনি সহ্য করবার ক্ষমতা দেন।

জীবনপথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে বহু সমস্যা আসে ও তার সমাধান করতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের আহ্বানের থেকে যখন শয়তানের আহ্বান প্রবলতর হয়, তখন ঐ সমস্যার সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস, পরম পবিত্রতা ও অতি নম্রতাই আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে।

যৌবনের প্রথম অবস্থায় আমি হিন্দুধর্ম থেকে ঈশ্বরের সহস্রনাম শিখেছি। কিন্তু এই সহস্রনামই যে তাঁর নামের সম্পূর্ণ তালিকা তা নয়। আমার মনে হয় যে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব যত তাঁর নামও তত। সেইজন্য ঈশ্বরকে কোনও নির্দিষ্ট নামে ডাকা যায় না; তাঁকে অনেক আকারে কল্পনা করা হয়, সেইজন্য তিনি নিরাকার, বহুভাবে তিনি কথা বলেন, অতএব তিনি বাকহীন। ইসলাম ধর্ম অনুধাবন করে সেখানেও আমি ঈশ্বরের অনেক নাম পেয়েছি।

ঈশ্বরই প্রেম—একথা যাঁরা বলেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমার মতে ঈশ্বর প্রেম হলেও সর্বোপরি তিনি সত্য। মানুষের পক্ষে যদি ঈশ্বরের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে আমার সিদ্ধান্তে ঈশ্বরই সত্য। দু'বছর আগে আমি বলেছিলাম যে সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বর সত্য এবং সত্যই ঈশ্বর। এই দুই

উক্তির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। পঞ্চাশ বছর ধরে অবিরত ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। তারপরে আমি দেখলাম যে প্রেমের মধ্য দিয়েই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় প্রেম শব্দের অনেক অর্থ আমি দেখেছি, আর কামনামূলক মানুষের প্রেম যে খারাপ হতে পারে তাও দেখেছি। আর আমি পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোককেই অহিংসা অর্থে প্রেম শব্দকে সমর্থন করতে দেখেছি। কিন্তু সত্য শব্দের দ্বিতীয় অর্থ আমি কখনও পাইনি। এমন কি নিরীশ্বর-বাদীরাও সত্যের প্রয়োজনকে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। এই কারণেই আমি দেখেছি যে 'ঈশ্বরই সত্য' এই যুক্তির থেকে 'সত্যই ঈশ্বর' এই কথা বলা ভালো। ঈশ্বরের নামে অনেক লোক জঘন্য কাজ করে; বৈজ্ঞানিকরাও সত্যের নামে ঐ রকম কাজ করে থাকেন। হিন্দু দর্শনে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই একথা বলা হয় এবং এই একই সত্য ইসলাম ধর্মের কলমায় জোর দিয়ে উদাহরণের সাহায্যে বলা হয়েছে। সেখানেও একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুত, সংস্কৃত ভাষায় সত্য শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'সৎ' অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে। এই কারণে এবং আরও অন্য কারণে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে 'সত্যই ঈশ্বর'। এই যুক্তিই আমাকে বেশী সন্তুষ্ট করে। সত্যকে যদি ঈশ্বররূপে চাওয়া যায়, তাহলে প্রেম ও অহিংসাই তার একমাত্র উপায়। উপায় ও সিদ্ধির ক্ষেত্রে একের স্থানে অন্যকে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ এরা পরিবর্ত্তনযোগ্য। সেইজন্য আমি একথা বলতে দ্বিধা করি না যে ঈশ্বরই প্রেম।

তা'হলে সত্য কি? এটি কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু আমি এই

প্রশ্নের এইভাবে সমাধান করছি যে বিবেকের যে স্বর অন্তরে আলোড়ন জাগায় তাই সত্য। এর থেকে একথা মনে হতে পারে—তা'হলে কি করে বিভিন্ন লোকের সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ ধারণা হয়? মানুষের মন বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে কাজ করে ও মনের ধারাও সকলের সমান নয়। সেইজন্য মনে হয় একজনের কাছে যা সত্য, অপরজনের কাছে তা সত্য নাও হতে পারে। আর যাঁরা এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন, তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে ঐ পরীক্ষা করতে গেলে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থায় উন্নীত হতে হয়।

বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মিথ্যা এমনভাবে স্থান করে নিয়েছে যে আমরা কোনও নিয়ম না মেনে বিবেকের অনুশাসনে চলি। এর থেকে আমার মনে হয় যে যার মধ্যে নম্রতা নেই সে সত্যের সন্ধান পায় না। যদি কেউ সত্যের সমুদ্রে অবগাহন করে তাহলে তারই সঙ্গে একাত্ম হয়।

সত্য যেখানে, প্রকৃত জ্ঞানও সেখানে। সত্যের অভাব থাকলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। এইজন্যই 'চিৎ' অর্থাৎ জ্ঞান শব্দটি ঈশ্বরের নামের সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃত জ্ঞান যেখানে, সেখানে আনন্দ বিরাজিত। দুঃখের কোনও স্থান সেখানে নেই। সত্য শাশ্বত—অতএব আনন্দও তাই। সেইজন্য ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ (সৎ-চিৎ-আনন্দ) বলা হয় অর্থাৎ তিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের আধার।

সত্যই প্রেম, কোমলতা ও আনন্দের উৎস। সত্যের উপাসককে ধূলিকণার মতই দীন হতে হবে। সত্যদৃষ্টি লাভ হলে নম্রতা বেশী হয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি তাইই দেখেছি। এক বছর আগে সত্য ও নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল, তার থেকে

অনেক স্পষ্ট ধারণা আমার হয়েছে। 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা'—মহাসত্যের এই বিস্ময়কর অর্থ দিনে দিনে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এর থেকেই আমরা ধৈর্য্য শিখি। সত্য আমাদের সমস্ত কাঠিন্য দূর করে সহনশীল করে। সত্য জ্ঞানের প্রভাবে আমরা নিজেদের সামান্য দোষকেও বেশী করে আর অপরের পর্বতপ্রমাণ দোষকে কম করে দেখতে শিখি। অহংবোধ থাকলে দেহ থাকে। শরীর অথবা অহংবোধ লুপ্ত হলে সেই অবস্থাই মোক্ষ। যে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে তাকে সত্যের প্রতীক অথবা তার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়েছে বলা যায়। অতএব দাসানুদাসই ঈশ্বরের প্রিয় নাম। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, সম্পদ এ সবই সত্যেরই অনুগত। সত্যকে সন্ধান করতে গিয়ে এদের সকলকেই উৎসর্গ করে দিতে হবে।

২। সত্য ও অহিংসা

অহিংসা ও সত্য এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে সেই জটিল গ্রন্থি খুলে তাদের পৃথক করা অসম্ভব। এরা যেন একই মুদ্রার বা চিহ্নহীন ধাতুময় চাকতির দুটি দিক। এর কোনটি সোজা আর কোনটিই বা উল্টো দিক তা কে বলতে পারে? তবুও অহিংসা হচ্ছে উপায় আর লক্ষ্য সত্য। উপায়কে উপায় বলেই যদি ধরা হয় তবে তা নিশ্চয়ই আমাদের অসাধ্য নয়। আর সেইজন্যই অহিংসা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। নিষ্ঠার সঙ্গে এই উপায় অবলম্বন করলে একদিন না একদিন আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্যে পৌঁছবো। এই সূত্র ধরে চললে পরিণামে জয়লাভ সুনিশ্চিত। যদি আমরা কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হই বা সাময়িক কোনো বিপদের ভার যদি আমাদের বহন করতে হয় তবুও আমরা সত্যের অনুসন্ধানে বিরত হব না। কারণ সত্যই ঈশ্বর—অতএব নিত্য।

অহিংসা লক্ষ্য নয়—সত্যই লক্ষ্য। কিন্তু অহিংসার অনুশীলন ছাড়া মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যকে বোঝবার আমাদের কোনো উপায় নেই। অহিংসার একনিষ্ঠ সাধনায় সত্যকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়—কিন্তু হিংসায় তা হয় না। সেইজন্যই আমি অহিংসার শপথ নিয়েছি। আর তার থেকেই সত্যকে খুঁজে পেয়েছি। অনেক সংগ্রামের পরে আমি অহিংসায় দীক্ষিত হয়েছি।

কিন্তু অহিংসাই তো পথ, তাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অহিংসার জন্য উদ্বেগ থাকে বেশী। সেইজন্য আমাদের জনগণকে

অহিংসায় দীক্ষা নিতে হবে। এর স্বাভাবিক পরিণতিরূপে সত্যের দেখা মিলবেই।

অহিংসা ও সত্য উভয়ই আমার ঈশ্বর। অহিংসাকে যখন খুঁজি, সত্যের মধ্যেই তার সন্ধান মেলে, আর সত্যকে খুঁজতে গেলে অহিংসার মাধ্যমেই তা পাওয়া যায়।

আমি পৃথিবীকে নতুন কিছু শিক্ষা দিচ্ছি না। সত্য ও অহিংসা পর্বতের মতই সুপ্রাচীন। আমি সত্য ও অহিংসার জন্য সাধ্যমত পরীক্ষা করে যাচ্ছি। তা করতে গিয়ে ভুল করেছি কত সময়, আর সেই ভুলের মধ্যে দিয়েই হয়েছে আমার শিক্ষা। এইভাবে সত্য ও অহিংসার অনুশীলনে জীবন ও তার নানা সমস্যাই আমার কাছে যেন পরীক্ষার মত মনে হয়েছে।

সত্যবাদিতা আমার প্রকৃতির ধর্ম, কিন্তু অহিংসা তা নয়। কোনও এক সময়ে একজন জৈনমুনি বলেছিলেন যে অহিংসাকে তিনি যত না সমর্থন করেন, সত্যকে করেন তার থেকে বেশী। আমি অহিংসাকে প্রথম স্থান ও সত্যকে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছি। তিনি বলেছেন যে সত্যের জন্য তিনি অহিংসাকেও বিসর্জন দিতে পারেন। আসল কথা এই যে সত্যের অনুসন্ধান করবার কালেই আমি অহিংসার খোঁজ পেয়েছি।

পঞ্চাশ বছরেরও বেশী আমি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অহিংসা ও তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুশীলন করেছি। আমি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—গার্হস্থ্যজীবনে, সংগঠনের ব্যাপারে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে—সর্বত্রই এই নীতির প্রয়োগ করেছি। কোনও ব্যাপারেই কিন্তু আমার হার হয় নি। অসফল হলে মনে করে নিয়েছি যে তা আমারই অসম্পূর্ণতা। আমার মধ্যে সম্পূর্ণতা আছে

বলে আমি দাবী করি না। তবে আমি একথা জোর গলায় বলবো যে আমি সত্যের একজন একনিষ্ঠ সাধক। কারণ সত্য ঈশ্বরেরই আর এক রূপ। এই সাধনার মধ্যে দিয়েই অহিংসাকে আবিষ্কার করেছি। এই নীতির প্রচারই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করা ছাড়া আমার বেঁচে থাকার কোনও আগ্রহ নেই।

প্রাচীন ভারতে আত্মোৎসর্গের যে আদর্শ ছিল তাকে ভারত-বাসীর চোখের সামনে তুলে ধরবার মত দুঃসাহসিক কাজে আমি ব্রতী হয়েছি। কারণ সত্যাগ্রহ ও তার আনুসঙ্গিক সবকিছু, অসহযোগ ও শান্ত বিরোধের অর্থই হল দুঃখকে বরণ করে নেওয়া।

হিংসার মধ্যেও অহিংস নীতির আবিষ্কার করেছিলেন যে ঋষিরা, তাঁরা নিউটনের থেকেও প্রতিভাবান ছিলেন। ওয়েলিংটনের থেকে বড় যোদ্ধা তাঁরা। নিজেরা অস্ত্রের ব্যবস্থার জেনেও তাঁরা তার অসারতা বুঝেছিলেন ও যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে অহিংসার মধ্যেই মুক্তি, হিংসায় নয়।

অহিংস নীতি অনুসরণ করে চললে জেনেশুনেই দুঃখকে বরণ করে নিতে হয়। অহিংসার অর্থ এই নয় যে দুষ্কৃতকারীর কাছে বিনীত বশ্যতা স্বীকার করা, বরং এর বিরুদ্ধে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা। এই নীতি অনুসরণ করলে একজনমাত্র মানুষের পক্ষেও তার নিজের সম্মান, ধর্ম ও আত্মার রক্ষার জন্য নীতিহীন এক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে বাধা দেওয়া ও সেই সাম্রাজ্যের পতন বা পুনরুত্থানের জন্য ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব।

সেইজন্য আমি ভারতবর্ষকে তার দুর্বলতার জন্য অহিংস হতে বলছি না। নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েই সে অহিংসা

নীতির উপাসনা করুক। তার শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে কোনও অস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজন নেই। আমরা কিন্তু এর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি, কারণ আমরা নিজেদের মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই ভাবি না।

আমি চাই ভারতবর্ষ বুঝুক যে সে এমনই এক আত্মার অধিকারী যা শাশ্বত—যা সমস্ত দৈহিক ক্ষুদ্রতাকে জয় করতে পারে আর পৃথিবীর সকল শক্তি একত্র হলেও তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা যার আছে।

সুদূর অতীত থেকে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষ ক্রমশ অহিংসার পথে অগ্রসর হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রথমে ছিল নরভুক। তারপর এমন এক সময় এল যখন তারা নরমাংস ত্যাগ করে মৃগয়া করতে শুরু করলো। ক্রমে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার শিকারী জীবনের জন্য লজ্জাবোধ করতে লাগলো। এইভাবে সে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে সভ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। গ্রাম ও নগর গড়ে তুললো—পরিবারের সভ্য থেকে ক্রমে ক্রমে সম্প্রদায় ও জাতির সভ্য তালিকাভুক্ত হল। এ সবই অহিংসার ক্রমোন্নতি ও হিংসার অবনতির নিদর্শন। তা না হলে অন্য ইতরপ্রাণীর মতই মানুষের নাম পৃথিবীর ইতিহাস থেকে লুপ্ত হত।

মহাপুরুষ ও অবতারদের কাছে আমরা অহিংসার শিক্ষাই পেয়েছি। তাঁরা একজনও হিংসার শিক্ষা দেননি। আর এ ছাড়া তাঁরা আর কি বা শিক্ষা দিতেন? কারণ হিংসা মানুষকে শিক্ষা দিতে হয় না। প্রাণী হিসাবে মানুষ সহিংস কিন্তু তার আত্মা অহিংস। যখনই তার আত্মবোধ জাগে, তখনই সে হিংসা ভুলে যায়। হয় মানুষের অহিংসার পথে ক্রমোন্নতি হয়, নয়ত ধ্বংসের

পথে এগিয়ে চলে। এইজন্য মহাপুরুষ ও অবতাররা অহিংসার বিশেষ যে গুণ—সত্য, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়, তার শিক্ষাই দিয়েছেন।

আমার মনে হয় এখনও সমাজের যে গঠন ব্যবস্থা তাতে অহিংসার কোনও স্থান নেই ; তবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যে তাদের ধনসম্পদ রক্ষা করে জীবন ধারণ করছে, এর মূলে আছে একের অন্যকে সহ্য করবার শক্তি। তা যদি না হত তবে মুষ্টিমেয় হিংস্র প্রাণীই কেবল পৃথিবীতে বেঁচে থাকত। কিন্তু তা হয় নি। একটি পরিবারের সকলের মধ্যে যেমন স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন আছে, বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যেও তা আছে। তারা অহিংসা নীতির প্রাধান্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। এর ফলে তারা অহিংসা ও তার বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করে না। আমি মনে করি যে এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যই আমরা ধারণা করেনি যে যারা সংযমী হয়ে সর্বত্যাগের ব্রত নিয়েছে তাদের পক্ষেই অহিংস নীতির অনুশীলন সম্ভব। যারা অহিংসার সমর্থক তারাই কেবল এর সম্বন্ধে পরীক্ষা করে এই শাশ্বত নীতির নতুন সম্ভাবনার কথা সকলের কাছে প্রচার করতে পারে। একথা যদি সত্য হয় তবে তা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। অহিংস নীতি প্রয়োগ করে যদি কেউ অকৃতকার্য্য হয়, তবে সে অকৃতকার্য্যতা তারই, ঐ নীতির নয়। তারা অনেকেই জানে না যে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তারা ঐ নীতিরই অধীন। মা যখন সন্তানের জন্য মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি নিজের অজান্তেই ঐ নীতি পালন করেন। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি এই নীতিকে সমর্থনের জন্য ও অসফল হলেও অদম্য উৎসাহে এই নীতির অনুশীলনের জন্য প্রচার করে আসছি। পঞ্চাশ বছর কাজ করে আমি অভূতপূর্ব ফল পেয়েছি

আর আমার বিশ্বাসও দৃঢ় হয়েছে। আমি একথা জোর গলায় বলছি যে অবিরত অহিংসার অনুশীলন করে আমরা যে ন্যায্য সম্পদের অধিকারী হব, তা সর্বকালের সর্বজনের সম্মান ও স্বীকৃতি পাবে। এই সম্পদ যে কলঙ্কলিপ্ত হবে না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের চারিদিকে অসাম্যের যে উদ্ধত প্রকাশ দেখি, এ তাও নয়। অন্যায্য ও নীতিবিরুদ্ধ সম্পদ যে অহিংসার সমর্থকদের ভয়স্তম্ভিত করবে—সে সমস্যাও নেই। অহিংস নীতির উপাসকদের হাতে আছে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ রূপ অস্ত্র—এই অস্ত্র যদি সঠিক বিবেচনার সঙ্গে নীতি অনুযায়ী প্রয়োগ করা যায়, তবে তা সহিংস নীতির পরিবর্তে কাজ করতে পারে। অহিংস নীতি সম্বন্ধে সবকিছু জ্ঞানই যে আমি দিচ্ছি তা নয়। এ এমনই নীতি যার সবকিছু জানা যায় না। আমার যতদূর মনে হয়, কোনও পদার্থ বিজ্ঞানই এমন কি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধেও আমরা একেবারে সবকিছুই জেনে ফেলতে পারি না। আমি একজন সত্য সন্ধানী মাত্র।

এই যুগে যখন আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রতিনিয়তই ঘটছে, তখন নতুন কোনও বস্তু বা ধারণাকে অর্থহীন বলা চলে না। কঠিন বলেই তা অসম্ভব—একথা বলাও যুগধর্মের অনুযায়ী হয় না। অকল্পনীয় যা, তা প্রতিনিয়ত ঘটছে, অসম্ভবও সম্ভব হচ্ছে। হিংসার ক্ষেত্রে এখন আশ্চর্য্য আবিষ্কার দেখে আমরা ক্রমশই বিস্ময়বোধ করছি। কিন্তু আমার ধারণা যে আরও অনেক বেশী অবাস্তব ও অসম্ভব আবিষ্কার অহিংসার ক্ষেত্রে সম্ভব হবে।

দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে সমস্ত রকম প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকার অর্থ অহিংসা নয়। অপর দিকে আমার মতে অহিংসা এমনই এক শক্তি যা দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিবাদ—প্রতিহিংসার থেকেও এই

শক্তি কার্য্যকরী, কারণ প্রতিহিংসা দুষ্কৃতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আমি দুর্নীতির প্রতিবাদে এক মানসিক ও নৈতিক বিরুদ্ধতা পোষণ করি। অত্যাচারীর অস্ত্রের আঘাতকে আমি তীক্ষ্ণতর অস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করি না ; কিন্তু আমার দৈহিক শক্তি প্রয়োগ না করে তার আশাকে নির্মূল করি। আমার আত্মশক্তির আঘাতে প্রথমে সে বিফল হয়। পরে হতবুদ্ধি হয়ে একে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এই স্বীকৃতি তার মধ্যে হীনতাবোধ আনে না বরং তাকে উন্নত করে। এই অবস্থাকে আদর্শ বলা যায়।

অহিংসা উন্নত ধরনের এক সক্রিয় শক্তি। একে আত্মশক্তি বা ঐশ্বরিক শক্তি বলা যায়। অসম্পূর্ণ মানুষ এর সারমর্ম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারে না। এর পরিপূর্ণ তেজ সহ্য করবার ক্ষমতা তার থাকে না। কিন্তু এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাও যদি আমাদের মধ্যে সক্রিয় হয়, তা হলেও তা আশ্চর্য্যজনক কাজ করতে পারে।

নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করাই প্রথম প্রয়োজন।

গর্ব ও অহংবোধ যার আছে, তার কাছে অহিংসার কোনও স্থান নেই। বিনয় না থাকলে অহিংস হওয়া যায় না।

যখন আমার মধ্যে সামান্যতম অহংবোধও ছিল না, তখনই আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের শক্তিকে প্রকাশ করতে পেরেছি।

অহিংস হওয়ার জন্য বাইরের কোনো শিক্ষার দরকার হয় না। এর জন্য দরকার হয় এমন এক ইচ্ছাশক্তির যারফলে আমরা যেন প্রতিহিংসায় একজনকেও না হত্যা করি ও প্রতিশোধ না নিয়ে দরকার হলে যেন সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে দ্বিধাবোধ না করি। অহিংসার সম্বন্ধে এ কোনো ধর্মকথা নয় কিন্তু একটা

সঠিক যুক্তি ও সর্বজনগ্রাহ্য নীতি। এই নীতিতে যার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে—কোনো উত্তেজনার ফলেই তার সহ্য শক্তি কখনও নষ্ট হতে পারে না। সাহসী যারা তাদের অহিংসার নীতি এই।

ভালবাসা কখনও দাবী করে না; চিরকাল এ দিয়েই থাকে। ভালবাসা নিজে দুঃখ সহ্য করে কিন্তু কখনও বিরক্ত হয় না বা প্রতিশোধস্পৃহাও তার নেই।

প্রেম যেখানে জীবনও সেখানে। ঘৃণা কেবল ধ্বংসই করে।

প্রেম এক সর্বতোময় শক্তি। এর থেকেই অতি বিনয়ের উদ্ভব।

প্রেমই আমার একমাত্র অস্ত্র; এর জন্যেই সকলের ওপরে আমার প্রভাব। আমি কল্পনাবিলাসী নই। কিন্তু একজন বাস্তব আদর্শবাদী। অহিংসা নীতি কেবল ঋষি ও সাধুদের জন্য নয়। এই নীতি সর্বসাধারণের। অহিংসা নীতি মানুষের কিন্তু হিংসা পশুর ধর্ম। পশুদের আত্মা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, দৈহিক শক্তি ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। আত্মশক্তির কাছে, উচ্চতর এক নীতির কাছে বশ্যতা স্বীকারেই মানুষের গৌরব।

অহিংসাকে ভিত্তি করে সমাজের ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না— এটা বলাই বর্তমান যুগের রীতি। এ সম্বন্ধে আমি বলছি। কোনো পরিবারে পিতা যখন অবাধ্য পুত্রকে আঘাত করে, পুত্র তার জন্য প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করে না। সে সেই আঘাতের ভয়ে যে পিতাকে মান্য করে তা নয়, তার প্রতি পিতার স্নেহকে অনুভব করেই সে মান্য করে। আমার মতে এই দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কি ভাবে গড়ে ওঠা উচিত, তারই পথনির্দেশ। পরিবারের পক্ষে যা সত্য সমাজের ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই সত্য—কারণ সমাজকে বৃহত্তর পরিবার বলা চলে।

অহিংসা নীতিরূপ ধর্মমতই আমার এক অতি সক্রিয় শক্তি। কাপুরুষতা বা দুর্বলতার সেখানে কোনও স্থান নেই। সহিংস যে সে তবু কোনও না কোনোও সময়ে অহিংস হতে পারে কিন্তু কাপুরুষের পক্ষে অহিংস হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্যই আমি আগেও বলেছি আর এখনও বলছি যে যদি আমরা নিজেদের, দেশের নারী জাতি ও ধর্মস্থানকে দুঃখ সহ্য করেও অর্থাৎ অহিংস উপায়ে রক্ষা করতে না পারি, তাহলেও সত্যিকারের মানুষ হলে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করেও তাদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের থাকবে।

অন্ধ যে তাকে যেমন সুন্দর কোন দৃশ্য দেখতে বলতে পারি না, সেইরকমই কাপুরুষের কাছে অহিংসা নীতির প্রচার করতে পারি না। অহিংসা সাহসিকতার চূড়ান্ত।

অহিংস হতে গেলে পৃথিবীতে দীনহীন যারা তারা যে জিনিস থেকে বঞ্চিত, তা পাওয়ার আকাঙ্খা আমাদের যেন কখনও না হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অহিংসা নীতির প্রয়োগ না করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে যাওয়া ভুল। আগে নিজের ঘরে অহিংসা নীতির প্রয়োগ করে পরে তা অপরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

চরিত্রধন না থাকলে সত্যাগ্রহ অসম্ভব।

সত্যাগ্রহী হতে হলে সরল প্রকৃতির, ভদ্র ও সংযমী হতে হবে। কারও প্রতি সে শত্রুভাবাপন্ন হবে না, সুবিবেচিত এক আদর্শ তার সামনে থাকবে। সে যেন অব্যবস্থিতচিত্ত না হয় আর এর পেছনে যেন কোনও অসদাভিপ্রায় বা বিদ্বেষ না থাকে।

সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে আমি প্রথম দিকে দেখেছি যে সত্যের অনুসন্ধান করলে বিরুদ্ধপক্ষের প্রতি কোনও হিংসা থাকে না উপরন্তু

ধৈর্য্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে তার ভুলটাকে দূর করে দেওয়া হয়। কারণ একজ:নর কাছে যা সত্য অপরজনের কাছে তা অসত্য হতে পারে। ধৈর্য্য ধারণ করতে গেলেই দুঃখ সহ্য করতে হয়। সত্যকে রক্ষা করার জন্য বিরুদ্ধপক্ষকে কষ্ট না দিয়ে নিজেকেই কষ্ট করতে হয়—এ মতবাদের অর্থই তাই।

একই সঙ্গে সত্য ও অহিংসার আশ্রয় নিলে পৃথিবীকে বশে আনা যায়। রাজনৈতিক অর্থাৎ জাতীয় জীবনে সত্য ও নম্রতার শিক্ষাই সত্যাগ্রহের সারমর্ম।

অহিংসার প্রকৃতি এমনই যে সে শক্তি চায় না বা তা তার লক্ষ্যও নয়। কিন্তু অহিংসার ক্ষমতা আরও বেশী; অহিংসা শাসনযন্ত্র হাতে না নিয়েই তাকে দমন ও পরিচালনা করবার ক্ষমতা রাখে। এখানেই এর সৌন্দর্য।

অন্যায়কারীকে হতবুদ্ধি করবার ইচ্ছা সত্যাগ্রহীর থাকে না। সত্যাগ্রহ অন্যায়কারীর মনে ভয়ের উদ্রেক করে না, কিন্তু তার মনে আলোড়ন জাগায়। সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য অন্যায়কারীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন করা, তাকে দমন করা নয়। সব বিষয়েই সত্যাগ্রহীর কৃত্রিমতা বর্জন করা উচিত। অন্তরে যেমন সাড়া সে পায়, সেই অনুযায়ী সমস্ত রকম কৃত্রিমতা ত্যাগ করে সে কাজ করে যায়।

দুষ্কৃতি ও দুষ্কৃতকারীর মধ্যে যে পার্থক্য, তা যেন সত্যাগ্রহী কখনও না বিস্মৃত হয়। দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে কোনও অসদ্ভাব বা বিদ্বেষও তার থাকা উচিত নয়। সত্যাগ্রহী সব সময় সত্যের মাধ্যমে অসত্যকে, প্রেমের মাধ্যমে ক্রোধকে, সুকৃতির মাধ্যমে দুষ্কৃতিকে ও অহিংসার মাধ্যমে হিংসাকে জয় করতে চেষ্টা করবে।

পৃথিবী থেকে মন্দকে দূর করবার অন্য কোনো উপায় নেই।

সত্যাগ্রহ এক অতি শক্তিশালী সক্রিয় পন্থা। সেইজন্য সত্যাগ্রহী অন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে তবেই সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেবে। সত্যাগ্রহীকে অনবরত শাসকগোষ্ঠী ও জনগণের কাছে আবেদন জানাতে হবে, জনগণকে শিক্ষা দিতে হবে, যে শুনতে চাইবে তাকে শান্ত ও স্থিরভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। এইসব ব্যাপারেই আগে অন্য উপায় প্রয়োগ করে শেষে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু অন্তরের আকুল আহ্বান শুনে যখন সে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করবে তখন আর সেখান থেকে ফিরে আসার পথ নেই।

সত্যাগ্রহী কর্তৃপক্ষকে হতবুদ্ধি করবার জন্য কারাবরণ করে না, কিন্তু নিজের নিরপরাধিত্ব প্রমাণ করে তাদের মত পরিবর্তনের জন্যই কারাগারে যায়। সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে কারাবরণ করবার মত নৈতিক যোগ্যতা না থাকলে তা নিরর্থক, আর পরিণামে হতাশাই এনে দেয়।

সত্যাগ্রহীর কোনো ভয় থাকে না। সেইজন্য তার বিরুদ্ধ পক্ষকেও সে কখনও বিশ্বাস করতে ভয় করে না। এমন কি বিরুদ্ধপক্ষ তার প্রতি যত বেশী মিথ্যাচরণ করে, সত্যাগ্রহী তত বেশী তাকে বিশ্বাস করে। কারণ মানুষের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই সত্যাগ্রহের সারমর্ম।

অনেকে বলে থাকেন যে অহিংসা জনগণকে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে কদাচিৎ ক্ষেত্র বিশেষে তা বোঝানো সম্ভব। আমার মতে একথা বলার অর্থ নিদারুণ আত্মপ্রবঞ্চনা করা। অহিংসা যদি মানুষের ধর্ম না হত, তাহলে অনেক আগেই সে

আত্মধ্বংসী হত। কিন্তু হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ্বে অহিংসাই পরিণামে জয়লাভ করে।

আসল কথা এই যে, অহিংসাকে রাজনীতিতে সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় বলে জনগণের মধ্যে প্রচার করবার জন্য অপেক্ষা করার মত ধৈর্যেরই আমাদের অভাব। বেশীর ভাগ মানুষই যখন ক্রোধ, ঘৃণা ও অসদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন, তখন অহিংসানীতির অনুশীলন তাদের পক্ষে কি করে সম্ভব? তুচ্ছতম চাহিদার জন্য তাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ দেখা যায়।

আমার মনে হয় যে সকলের ভালোর জন্যেই তারা অহিংসা নীতির অনুশীলন করতে পারে। হাজার হাজার স্ত্রীলোক যখন নিষিদ্ধ লবণ সংগ্রহ করেছে, তখন তাদের কারও প্রতি কি অসদ্‌ভাবে ছিল? তারা জানত যে কংগ্রেস বা গান্ধীর কাজই তারা করছে, তাদের ওপরেই বিশ্বাস ও আশা নিয়ে তারা এই কাজ করেছে। আমার মতে চম্পারণই নিখুঁত অহিংসার আদর্শ দেখিয়েছে। হাজার হাজার রায়ত যখন কৃষিবিষয়ক ত্রুটির বিরুদ্ধাচরণ করে বিদ্রোহী হয়েছিল, তখন তাদের শাসকগোষ্ঠীর বা নীলচাষীদের বিরুদ্ধে কি কোনও বিদ্বেষ ছিল? অহিংসা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। তাদের নেতাদের ওপরেই ছিল পুরোপুরি বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসই হচ্ছে আসল কথা। কিন্তু যারা নেতৃত্ব করে, তাদের ক্ষেত্রে অন্য ব্যাপার। তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে যেন ঐ নীতির বিষয়ে জ্ঞান থাকে, আর ঐ বিশ্বাসের প্রতিফলন যেন তাদের কাজে থাকে।

কি করে আমরা কোনও মানুষ বা সম্প্রদায়কে এই কঠিন সাধনায় শিক্ষা দেব!

এর কোনো সোজা পথ নেই। মনের মধ্যে কেবল ধর্মমতকে

জাগ্রত রাখতে হবে। প্রকৃত উপদেশ হচ্ছে তাই। মানুষের জীবনে এর সন্ধান পেতে হলে কঠোর অধ্যয়ন অসীম অধ্যবসায় ও সমস্ত দুর্নীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা দরকার। পদার্থ বিজ্ঞানকে জানতে গেলে যদি এক জীবন কেটে যায়, তাহলে সেই মহান আধ্যাত্মিক শক্তিকে জানবার জন্য কত জীবনের দরকার? কয়েক জীবনও যদি লাগে তবু চিন্তা কেন? কারণ এই যদি জীবনে একমাত্র শাশ্বত হয়, একেই যদি একমাত্র বস্তু বলে মনে করা যায়, তাহলে একে জানবার জন্য তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, তা ব্যর্থ নয়। প্রথমে স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধান কর, তাহলেই আর সবই আয়ত্তে আসবে। এই স্বর্গরাজ্য হল অহিংসা।

গণবিদ্রোহই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ– এই নীতিতে বিশ্বাস করলে, এটা কি বিশ্বাস করা যায় যে সমস্ত রকম উত্তেজনার কারণ থাকা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের সময় তারা কর্মে ও চিন্তায় অহিংস থাকবে বা থাকতে পারবে? অহিংসাকে কাজে পরিণত করা একজন কারো পক্ষে সম্ভব কিন্তু সমস্ত লোকের পক্ষে তা সম্ভব বলে কি মনে হয়?

আজকের দিনে এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। আমাদের অহিংসা নীতির কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে যখনই বিদ্রোহ হয়েছে জনগণের মধ্যে তা হয়নি হয়েছে বুদ্ধিজীবী পরিচালিত এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে। প্রবল যুদ্ধে কোনও একজন হয়ত অহিংসানীতিকে বিসর্জন দিয়েছে, জনগণ কিন্তু তা করেনি বা করতে সাহসীও হয়নি। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার স্পৃহা যাই থাক না কেন, জনগণ আদেশ পেয়ে তবেই অস্ত্র ধারণ করেছে আরও বন্দুকও থামিয়েছে। পূর্বপরিকল্পিত কোনো যুদ্ধে যোদ্ধারা যেমন বিশেষ নিয়ম মেনে চলে, সেইরকমই যারা অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত, তারা বিদ্রোহের সময় ঐ

নীতি মেনে চলতে অপারগ। এ কথা কোনো যুক্তি দিয়েই বলা যায় না। অহিংসানীতির যিনি প্রধান তাঁর কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে। এই অহিংসা-যুদ্ধ চালাতে গেলে অনেক লোকের দরকার হয় না। অহিংসা নীতিকে সব জায়গায় ছড়িয়ে দেবার জন্য বেশী প্রচারের দরকার নেই। অল্প কয়েকজন পুরুষ বা নারীর মধ্যে যদি অহিংসা-নীতির শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বদ্ধমূল ধারণা থাকে, তাহলে জনগণের মধ্যে তার প্রচার হবেই। এই আন্দোলনের প্রথমদিকে আমার এইরকম ধারণাই হয়েছিল। আমি দেখেছিলাম যে সকলেই মনে করে অহিংসার প্রচার করলেও আমি একান্তভাবে সহিংস। এইভাবেই তারা নেতাদের কাছ থেকে বুঝতে শিখেছিল। কিন্তু যখন তারা আমাকে বুঝতে পারলো তখনই তারা অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়েও অহিংসা-নীতি পালন করতে লাগল। চৌরীচৌরার ঘটনা দ্বিতীয়বার আর ঘটেনি। যেখানে অহিংসানীতি চিন্তায়, ঈশ্বর সেখানে বিচারক। কর্মে ও চিন্তায় যদি অহিংসানীতিকে পালন না করা যায়, তাহলে অহিংস হওয়া যায় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিংসার দ্বারা প্রীতিকর কিছু হতে পারে না। পশুত্বের জবাব পশুত্বের মাধ্যমে দিতে গেলে নীতি ও বুদ্ধি একেবারে বিসর্জন দিতে হয় আর এর দ্বারা পাপচক্রের সৃষ্টি হয়।

হিংসার মধ্যে কোনও নীতি না থাকলেও যখন নিজেকে বা অসহায়কে রক্ষার জন্য তা প্রয়োগ করা হয়, তখন কাপুরুষতার সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করার থেকে তাকে সাহসিকতাই বলা চলে।

সমস্ত জাতিকে পৌরুষহীন করে রাখার থেকে আমি হাজারবারও সহিংস হতে বলি।

হিংসা ও কাপুরুষতার মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে হলে আমি হিংসাকেই নির্বাচন করতে বলি।

আমি চাই ভারতবর্ষ তার নিজের সম্মান রক্ষার জন্য হিংসাশ্রয়ী হোক্, কিন্তু সে যেন কাপুরুষ হয়ে তার নিজের অসম্মান সহ্য না করে।

হিংসাকে আমি মানি না; কারণ হিংসায় ভালো যা হয় তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু এর মন্দফল চিরস্থায়ী।

আমি বিশ্বাস করি যে অহিংসা হিংসার থেকে বড়, শাস্তিদানের থেকে ক্ষমাশীলতার মধ্যেই পৌরুষ। ক্ষমাধর্ম সৈনিকের পক্ষে প্রশসংনীয়। শাস্তিদানের ক্ষমতা যখন থাকে তখনই সংযমকে ক্ষমশীলতা বলা যায়। কিন্তু অসহায় বলে কেউ যদি ক্ষমা করে তাহলে তাকে ক্ষমা বলা চলে না বা তার কোনও অর্থও হয় না।

আমি ভারতবর্ষকে বা নিজেকে অসহায় বলে মনে করি না। দৈহিক শক্তিকে শক্তি বলা যায় না। অদম্য ইচ্ছাই এর উৎস।

ক্রোধ ও বিদ্বেষ ত্যাগ করে দুঃখ বরণ করে নিতে পারলে উদীয়মান সূর্যের মতই তা কঠিনতম হৃদয়ের ও সম্পূর্ণ অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে দেবে।

লোভ না থাকলে অস্ত্রশস্ত্রের কোনও প্রয়োজন হয় না। অহিংসা নীতির আদর্শ গ্রহণ করলে সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়।

একটা ব্যাপার ঠিকই। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উন্মত্ততা যদি চলতেই থাকে, তাহলে এমন হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে যা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কোনও জাতি জয়ী হলে পরিণামে তা তার মৃত্যুরই সামিল। অহিংসানীতির মহিমাময় প্রতিফলন যদি জীবনে না ঘটে, তা হলে ঐ আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা নেই।

আগামী দিনের পৃথিবী যে অহিংসার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে আমার কণামাত্র সন্দেহ নেই।

৩। বিশ্বাস এবং মূল্যায়ণ

একমাত্র আমার মধ্যেই ভগবান আছেন এমন দাবী আমি করিনা। আমি দিব্যদ্রষ্টাও নই। আমি নেহাতই একজন নগণ্য ব্যক্তি, সত্যানুসন্ধানই আমার উদ্দেশ্য; এবং সত্যকে খুঁজে বার করবই এই আমার কাজ। ভগবানের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য আমি যে কোনো রকম আত্মত্যাগকেই বিরাট কিছু মনে করি না। আমার সমস্ত কর্ম, এর যে নামই দেওয়া হোক না কেন—সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক বা ন্যায়, এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। আর আমি জানি ভগবান তাঁর সবচেয়ে হীন সৃষ্টিতেই বেশি প্রত্যক্ষ—বিশাল এবং বিরাটে তিনি ততখানি প্রত্যক্ষ নন। সেইজন্যই আমি হীন হবার জন্যই চেষ্টা করছি। হীনদের ছাড়া আমার মোটেই চলেনা, আর তাই অবদমিত শ্রেণীকে সেবা করার জন্য আমার এই আগ্রহ। আর যেহেতু রাজনীতিতে যোগ দেওয়া ছাডা তাদের সেবা করা সম্ভব নয় সেহেতু আমাকে রাজনীতিতে যোগ দিতে হয়েছে। সেই কারণেই আমি প্রভু নই—আমি ক্রমাগত কষ্ট করছি, ভুল করছি। আমি ভারতবর্ষের একজন নগন্য ভৃত্য মাত্র, আর এরই ভেতর দিয়ে আমি সমগ্র মানব সমাজকেই সেবা করে চলেছি। আমার জীবনকে টুকরো করে দেখা চলে না—এ এক অবিভাজ্য সম্পূর্ণ ব্যাপার। আমার সমস্ত রকম কর্মই একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কীত, আর সমস্ত রকম কর্মের উৎস হল মানব জাতির প্রতি আমার অতৃপ্ত ভালবাসা।

আমার প্রচার কিংবা শিক্ষার কোনোটাই আবেগের দ্বারা

চালিত বা অসম্ভব নয়—কারণ, আমি যা বলি তা কিছু নতুন কথা নয়, আর যা বলি তা আমি নিজেও করতে চেষ্টা করি। আমি এটা জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে আমি যা করি তা সকলের পক্ষেই করা সম্ভব, কেননা আমি অতি সাধারণ মানুষ। অতি সাধারণ মানুষের যে প্রলোভন, যে দুর্বলতার সম্মুখীন হতে হয় আমাকেও তেমনি হতে হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরো হচ্ছে যে, আমি যা করতে পারি তা একজন শিশুর পক্ষেও করা সম্ভব—এটা বলার আমি যথেষ্ঠ কারণও পেয়েছি। সত্যানুসন্ধানের যে সমস্ত উপায় আছে তা যেমন সরল তেমনি বিচিত্র। একজন একগুঁয়ে লোকের কাছে সেগুলো অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু একজন সরল শিশুর কাছে তাই সহজ। সত্যানুসন্ধান যাঁর ব্রত তাঁকে ধূলোর কণার মতই তুচ্ছ হতে হবে। পৃথিবীতে ধূলো সর্বদাই পদদলিত হচ্ছে, কিন্তু সত্যানুসন্ধানীকে ধূলোরও তলায় থাকতে হবে—এতই তাকে বিনম্র হতে হবে। আর তখনই—সে সত্যকে এক ঝলক দেখতে পাবে, তার আগে নয়।

আমাকে তপস্বী বললে ভুল বলা হবে। যে আদর্শগুলোর দ্বারা আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত সেগুলো সমগ্র মানব সমাজ গ্রহণ করতে পারেন। আমি ধীর বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এগুলোকে পেয়েছি। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে, বিবেচনা করতে হয়েছে এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হয়েছে। আমার মিতাচার এবং অহিংসা, এ-দুইই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি জনসাধারণের কাজে এ দুটোরই প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাকে যখন একঘরে হয়ে কাল কাটাতে হয়েছিল নানা অবস্থায়—গৃহস্থ, উকিল, সমাজ সংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠবার জন্য আমাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে

হয়েছিল আমার যৌন জীবনকে, অহিংসা এবং সত্যকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সময়—তা সে কেবল আমার স্বদেশবাসীর ক্ষেত্রেও যেমন তেমন ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রেও। আমি নিজেকে একজন সাধারণ ব্যক্তির বেশি ক্ষমতা আছে বলে কিংবা কম আছে বলে দাবী করিনা। আর এই যে আমার মিতাচার এবং অহিংসা, যেখানে কিনা আমি নানা কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানের ফলে উপস্থিত হয়েছি, সেগুলোকে আমার বিশেষ গুণ বলে মনে করি না। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, যে কোন নরনারীর পক্ষেই আমি যা করতে পেরেছি তা করা সম্ভব, যদি তাঁরা আমার মত চেষ্টা করেন, আমার মত বিশ্বাস এবং আশার সঙ্গে কাজ করেন।

আমার কাছে মুক্তির রাস্তা হল নিজের দেশের সেবার জন্য ক্রমাগত পরিশ্রম করে যাওয়া, এরই মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবকেও সেবা করা হয়। আমি চাই সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে এক অনুভব করতে। গীতায় যেমন লেখা আছে তেমনি আমি বন্ধু এবং শত্রু এই উভয়ের সঙ্গেই শান্তিতে বসবাস করতে চাই। যদিও সেই কারণে একজন মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান বা হিন্দু আমাকে অবজ্ঞা এবং ঘৃণা করতে পারে, কিন্তু তবুও আমি তাকে ভালবাসতে এবং সেবা করতে চাই—ঠিক যেমন আমার স্ত্রী এবং পুত্র আমাকে ঘৃণা করলেও তাদের আমি ভালবাসতে পারি। সেজন্য দেশপ্রেম আমার কাছে চির স্বাধীনতা এবং শান্তির পথের একটা অধ্যায় মাত্র। সেই কারণেই আমার কাছে রাজনীতি ধর্মহীন নয়। রাজনীতি হল ধর্মের দাস। ধর্মবিহীন রাজনীতি একটা মৃত্যু ফাঁদের মত—-কারণ তা আত্মাকে বিনষ্ট করে।

বিশ্বজনীন এবং সর্বপরিব্যাপ্ত সত্যের আত্মার সঙ্গে সামনাসামনি দাঁড়াতে গেলে বিশ্বের হীনতম প্রাণীর সঙ্গে নিজেকে একভাবে ধারণা

করতে হবে। যে তা করতে চাইবে তাকে জীবনের কোন ক্ষেত্র থেকেই সরে আসলে চলবে না। সেই কারণেই, আমার সত্যের প্রতি ভক্তি আমাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। তাই, আমি বিনা দ্বিধায় এবং বিনীতভাবে বলতে পারি যে, যাঁরা বলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই তাঁরা ধর্ম কি তা জানেন না।

আমি যখন দেখতে পাই কেউ কোনো ভুল করছেন তখন আমি নিজেকে বলি, আমিও তো ভুল করেছি। যখন আমি দেখি একজন লোভী ব্যক্তিকে তখন আমি বলি ওরকম ত আমিও ছিলাম, আর এইভাবেই আমি পৃথিবীর সমস্ত লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করি—আর এটা উপলব্ধি করি যে সবচেয়ে নিচে যে রয়েছে সে সুখী না হলে আমিও সুখী হতে পারব না।

আমার নিজের জীবনে আমি যা বারংবার করিনি তা আমি কখনো কাউকে করতে উপদেশ দিই না—আমার জোর এখানেই।

আমার জীবন দর্শনে লক্ষ্য এবং উপায় এ দুটি শব্দই এক। কেউ কেউ বলেন, 'উপায় হল উপায়ই, তার বেশী কিছু নয়।' আমি বলি, 'উপায় হল সব।' যে রকম উপায়, লক্ষ্যও সেই রকমই হয়। উপায় এবং লক্ষ্যের মধ্যে কোনো বাধা নেই, দেয়াল নেই। সত্যি কথাটা এই যে, ভগবান আমাদের উপায়ের প্রতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (তাও অতি সামান্য পরিমাণে) দিয়েছেন লক্ষ্যের প্রতি কিছুমাত্র নয়। লক্ষ্যে পৌঁছনো আর উপায় এ দুইই সমানভাবে মেশানো—এর কোনো ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।

উপায়কে একটা বীজের সঙ্গে তুলনা করা যায়—আর লক্ষ্যকে গাছের সঙ্গে। বীজের সঙ্গে গাছের সম্পর্ক যেমন বদলানো যায়না, তেমনি বদলানো যায়না লক্ষ্য এবং উপায়ের সম্পর্ক।

আমি সম্পূর্ণ নির্ভেজাল অহিংস কার্য্যক্রমে বিশ্বাসী। গোপনতা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

সমস্ত পাপ গোপনেই সম্পন্ন হয়। যখন আমরা উপলব্ধি করব যে ভগবান আমাদের চিন্তাকেও দেখছেন, তখনই আমরা স্বাধীন হতে পারবে।

যদি উপায় অপবিত্র হয়—লক্ষ্যও অপবিত্র হয়। সত্যের কাছে যেতে হলে অসত্যের মাধ্যমে যাওয়া যায় না। সত্যভাবই সত্যের কাছে পৌঁছে দেয়।

সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা আমাদের হাতে নেই। আমাদের যা করণীয় তা ভালভাবে করে গেলেই হল। আমার কাজই হল চেষ্টা করে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত ভগবান যা ভাল বোঝেন তাই হয়।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি ফল কি হবে তা নিয়ে চিন্তা না করবার শিক্ষা দিয়েছি নিজেকে। আমি কেবল উপায় সম্পর্কেই চিন্তা করেছি—আর যখনি দেখেছি আমার উপায়টা ঠিক আছে তখন বিশ্বাসই আমাকে চালিয়ে নিয়ে গেছে, আর কোন সাহায্য আমার প্রয়োজন হয়নি। ভয় এবং ভয়ের কাঁপুনি সেই বিশ্বাসের কাছে দূর হয়ে গেছে।

আমার সমগ্র জীবন ধরে আমি দেখেছি যে সত্যকে যতই একান্তভাবে কামনা করেছি ততই আমি দেখেছি আপোষের মধ্যেকার সৌন্দর্য। আমি আমার পরবর্তী জীবনে দেখেছি এটা সত্যাগ্রহের পক্ষে একটা অপরিহার্য অঙ্গ। অনেক সময়েই এর ফলে আমার জীবন বিপন্ন হয়েছে, বন্ধুদের অপ্রীতিভাজন হয়েছি, কিন্তু সত্য হচ্ছে হীরকের মত কঠিন, আর কুসুমের মত কোমল।

সমস্ত জীবন ধরেই আমাকে লোকে ভুল বুঝেছে। জনসাধারণের মধ্যে যিনিই কাজ করেন তাঁরই এই দশা। এরকম

কর্মীর গায়ের চামড়াটা একটু মোটা হওয়া দরকার। যদি সমস্ত ভুল বোঝাবুঝিকে পরিষ্কার করবার জন্য জবাব দিতে হত তাহলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। আমি আমার জীবনে একটা নিয়ম মেনে চলেছি আর সেটা হল নেহাত লক্ষ্যকে সংশোধন করবার প্রয়োজন না হলে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝিরই জবাব না দেওয়া। এই নিয়ম মেনে চলার ফলে নানারকম দুশ্চিন্তা থেকে আমি মুক্ত হতে পেরেছি, সময়ও অনেক বেঁচেছে।

আমি কেবল একজন সত্যানুসন্ধানী। আমি মনে করি আমি এই লক্ষ্যে পৌঁছনর উপায় খুঁজে পেয়েছি। আমি এজন্য সর্বরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছি—কিন্তু আমি স্বীকার করছি যে এখনো আমি সত্যকে খুঁজে পাইনি। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে পাবার অর্থ নিজেকে জানা, নিজের ভাগ্যকে জানা অর্থাৎ একেবারে নিখুঁত হওয়া। আমি আমার খুঁত সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন—আর আমার সমস্ত শক্তির মূলেও সেই জ্ঞান, কারণ নিজের শক্তির সীমা জানা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব।

আমি কেবল সত্যের পূজারী—আমি কেবল সত্যেরই শিষ্য।

আমার আশাবাদ দুর্দমনীয়—কেননা আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস আছে। এই কথাটায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়, নয় কি? কিন্তু আমি কথাটা বলছি আমার বিনয়ের গভীর দেশ থেকে। আমি ভগবানের মহাশক্তিতে বিশ্বাসী। আমি সত্যকে বিশ্বাস করি—আর তাই, আমার এই দেশের এবং মানবতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সন্দেহই আমার মনে নেই।

প্রাচীন কালের সমস্ত কিছুই শুধু প্রাচীন বলেই আমি ভাল মনে করিনা। পুরনো সংস্কারকে আমি ভগবানের দেওয়া বিচার ও বিবেচনা শক্তির আগে স্থান দিই না। সংস্কার—তা যত প্রাচীনই

হকনা কেন তা যদি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে দেশ থেকে তাকে বিদায় করে দেওয়াই উচিত। অস্পৃশ্যতা একটা প্রাচীন সংস্কার হতে পারে, বাল্য বিধবা এবং বাল্য বিবাহ প্রথা প্রাচীন সংস্কার হতে পারে—এ ছাড়াও আরো হরেক রকম জঘন্য প্রাচীন কুসংস্কার প্রচলিত আছে, ক্ষমতা থাকলে আমি এ সমস্তই ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতাম।

আমি বিশ্বাস করি, আমরা সকলেই ভগবানের দূত হতে পারি যদি আমরা মানুষকে ভয় না করে কেবল পরম সত্যকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি। আমি বিশ্বাস করি আমি কেবল পরম সত্যেরই অনুসন্ধান করছি এবং কোনো মানুষকেই ভয় করি না। আমি একই কথা সর্বদা হয়ত বলিনি। আমি সত্যের পূজা করি—তাই যা অনুভব করি, কোনো প্রশ্ন উপস্থিত হলে আমি তাই বলি। আগে ঐ বিষয়ে কি বলেছি তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার দৃষ্টি যত স্বচ্ছ হচ্ছে ততই আমার মতামত প্রতিদিনই স্পষ্ট হচ্ছে। যেখানে আমি আমার মত স্পষ্টতই তাড়াতাড়ি বদলেছি সেগুলো চট করে বোঝা যাবে, কিন্তু আমার মত যেখানে বিবর্তিত হয়েছে ধীরে ধীরে, সেখানে মত বদলটা ধরা পড়বে কেবল সতর্ক চোখের কাছে।

কোনো একটি প্রশ্নে আমার লক্ষ্য আমার পূর্বেকার বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা নয়, আমি সেই প্রশ্নকে বিচার করি সেই সময়কার সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ফল হয়েছে এই যে আমি সত্য থেকে সত্যান্তরে উত্তীর্ণ হয়েছি।

আমার সঙ্গে কারবার করা সহজ। আমি হয়তো কোনো দৃষ্টিভঙ্গীকে জোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকি, কিন্তু যখন দেখি আমার ভুল হয়েছে তখনি আমি সে মতকে বাতিল করে দিই।

আমি ভবিষ্যতে কি হবে জানতে চাইনা। বর্তমান সম্পর্কেই

আমার যত করণীয়। ভগবান আমাকে পরের মুহূর্ত নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা দেননি। আমাদের চারদিকে যে ঘন দুষ্প্রবেশ্য অন্ধকার বিরাজ করছে তা অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। তিনি আমাদের পরের পদক্ষেপটিকেই মাত্র দেখবার ক্ষমতা দিয়েছেন, আর স্বর্গীয় আলো এসে পড়ে যদি সেই স্থানটি উদ্ভাসিত হয় তাহলেই যথেষ্ট। আর তা হলেই আমরা নিউম্যানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে পারি, "এক পা চলাই অনেকখানি।" আর আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা নিশ্চিত জানি যে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সর্বদাই আমাদের দৃশ্যগোচর থাকবে। অন্য কথায় বলতে গেলে ঘন অন্ধকার আমরা যতখানি দুষ্প্রবেশ্য ভাবি ততখানি নয়। আমাদের অধৈর্যভাবই দেখতে চায় পরবর্তী পদক্ষেপেরও বাইরে আর তাই অন্ধকারকে মনে হয় অতখানি দুষ্প্রবেশ্য।

আমি বিশ্বাসী। আমি নিশ্চিতভাবে ভগবানকেই নির্ভর করি। আমার এক পা চলাই অনেকখানি। পরবর্তী পদক্ষেপ ভগবানই স্থির করে দেবেন—যখন সে সময় আসবে তখন।

আমি সম্পূর্ণ সৎ হবার জন্য পরিশ্রম এবং চেষ্টা করে চলেছি—সম্পূর্ণ সত্যবাদী এবং অহিংস হবার চেষ্টা করেছি, চিন্তায়, কথায় এবং কাজে, কিন্তু আমি যে আদর্শকে ধ্রুব বলে জানি সেখানে পৌঁছুতে সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছি। আমি স্বীকার করি এইভাবে উপরের দিকে চলা বেদনাময়—কিন্তু এই বেদনাই আমার পক্ষে পরম আনন্দের। প্রতি পদক্ষেপেই আমি যেন আরো সবল হয়ে উঠি, পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হতে থাকি। সত্যের প্রতি আমার এই ভরসাই আমার শক্তির মূলে। ঐ একই জায়গা থেকেই অহিংসার সূত্রপাত। আমি সত্যের মধ্যেই দেখতে পাই সুন্দরকে—কিংবা সুন্দরের মধ্য দিয়ে সত্যকে। সমস্ত সত্য—কেবল সত্য পূর্ণ ভাব নয়, সত্যপূর্ণ মুখ, সত্যপূর্ণ চিত্র কিংবা গীতও সুন্দর।

লোকেরা সাধারণত সত্যের মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান পায়না—সাধারণ লোক সৌন্দর্য থেকে দূরে থাকে আর সত্যের মধ্যেকার রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। যখনি মানুষ সত্যের মধ্যে দেখা পাবে সুন্দরের তখনি সত্যিকারের শিল্পের উত্থান হবে।

জীবন সমস্ত শিল্পের উপরে। আমি আরো একটু বাড়িয়ে বলব যে, যে মানুষের জীবন যত সর্বাঙ্গসুন্দর সে তত বড় শিল্পী। কারণ সে শিল্পের কি মূল্য যদি না তার ভিত সুদৃঢ় হয়, যদি না জীবনের কাঠামোটা হয় সুমহান ?

আমার দেশের জনসাধারণের তুঃখ তুর্দশা দূর করার চাইতে আমি তাদের পশু শক্তিকে পরাস্ত করতে বেশী আগ্রহী। আমি জানি যে মানুষ যখন নিজের ইচ্ছেয় কোনো তুঃখ গ্রহণ করে তখন সে মহান হয়—তার সঙ্গে সমগ্র মানবজাতিকেও মহান করে তোলে। আর আমি এও জানি যে মানুষ যখন তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য মরিয়া হয়ে পশুশক্তিকে প্রয়োগ করে, কিংবা তুর্বল দেশ বা তুর্বল মানুষকে পরাস্ত করতে সেই শক্তিকে প্রয়োগ করে তখন তারা নিজেদের যে নিচে নামায় কেবল তা নয়, তারা সেই সঙ্গে সমগ্র মানব জাতিকেও নিচে নামায়। আর কেবল আমি কেন, যে কোন ব্যক্তিই মানব সমাজকে পাঁকে ফেলতে দেখলে খুশি হতে পারেন না। আমরা যদি সকলেই একই ভগবানের সন্তান হই, আমরা যদি সেই একই ভগবানের অমৃত গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের সেই সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে পাপও, সে পাপ আমাদের কেউ করুক কিংবা অন্য জাতের কেউ করুক—কিছু এসে যায় না। আপনারা জানেন

মানুষের ভেতরকার পাশববৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা কি ভয়ানক ব্যাপার।

আমার লক্ষ্য হল বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন—এরজন্য আমি আমার সর্বোচ্চ ভালবাসার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার প্রবলতম প্রতিরোধ।

আমার কাছে কোনরকম অসাধুতাই প্রশ্রয় পাবে না। আমার কাছে সত্যাগ্রহের নীতি বা ভালবাসার নীতি একটা চিরকালীন ব্যাপার। আমি সমস্ত ভালর সঙ্গেই সহযোগিতা করে থাকি। আমি সমস্ত মন্দর সঙ্গে অসহযোগিতা করতে চাই। নিজেকে শুদ্ধ করবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করবার ফলে আমার ভেতরকার "শান্ত ছোট বাণী" স্পষ্ট এবং নির্ভুলভাবে শুনবার মত ক্ষমতা অর্জন করেছি।

ভগবানের বিশেষ ইচ্ছেকে প্রকাশ করবার ভার আমার উপর নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান নিজে প্রতিটি মানুষের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের ইচ্ছেকে প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু আমাদের কানে, "শান্ত ছোট বাণী" প্রবেশ করে না। আমি অনুভব করি তিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান।

এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র একজন অত্যাচারীকে আমি গ্রহণ করেছি—সে হল অন্তরের "শান্ত ছোট বাণী"

ইচ্ছে করলে যে কোন ব্যক্তিই এই বাণী শুনতে পারেন। এটা প্রত্যেকেরই ভেতরের ব্যাপার। তবে আর সব ব্যাপারের মতই এরজন্য পূর্বের নিশ্চিত প্রস্তুতি প্রয়োজন।

আমি যখনি আমার অন্তরের "শান্ত ছোট বাণী"কে স্তব্ধ করে দেব তখনি আমার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলব।

অন্তরে যে বাণী অবস্থান করে তা শুনতে পাওয়া এবং তার আদেশ পালন করার ফলেই আমার যতটুকু শক্তি তা আমি পেয়েছি। তারই ফলে আমার পক্ষে সামান্য দেশ সেবা করাও সম্ভব হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই চাননা যে আমার জীবনের এই সময়ে আমি অন্তরের বাণী না শুনে অন্য কোন বাণী শুনি এবং সেই মত কাজ করি।

জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন চুপ করে থাকা চলেনা, ব্যবস্থা নিতেই হয়। সে সময় হয়ত সবচেয়ে বড় বন্ধুরাও সে বিষয়ে একমত হতে পারেন না। যখনি কর্তব্য কর্মে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় তখন অন্তরের ঐ "শান্ত ছোট বাণী" ই পথ ঠিক করে দেয়।

আমাদের জীবনে কখনো এমন সময় উপস্থিত হয় যখন কোন কোন ব্যাপারে বাইরের কোনো প্রমাণেরই প্রয়োজন হয় না। আমাদের অন্তরের মাঝখান থেকে একটা মৃদু কণ্ঠস্বর আমাদের বলে দেয়, "তুমি ঠিক পথেই চলেছ—এবারে বাঁদিকেও যাবে না, ডান দিকেও নয়—সোজা চলে যাও সরু পথ বেয়ে।"

জন্ম এবং মৃত্যু এ দুটোই গভীর রহস্যে ভরা। মৃত্যু যদি অন্য কোন জীবনের ভূমিকা না হয় তাহলে এই মাঝামাঝি অবস্থাটা একটা নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র! মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত না হবার মত বিদ্যা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে—তা সে মৃত্যু যখনি আসুকনা কেন, যারই মৃত্যু হক না কেন। আমার মনে হয় তা সম্ভব হবে তখনি যখন আমরা নিজেদের ব্যাপারে উদাসীন হতে পারব। এই উদাসীনতা তখনই আসবে যখন আমরা প্রতি মুহূর্তে, আমাদের যা কিছু কর্তব্য তা করা হয়েছে বলে অবহিত হব।

জীবনে এমন অবস্থা আসে যখন চিন্তাধারাকে সোচ্চার করার প্রয়োজন হয় না বা বাইরের অভিব্যক্তি দিয়ে বুঝিয়েও দিতে হয়

না। কেবল চিন্তাতেই কাজ হয়। চিন্তাগুলি সেই শক্তি অর্জন করে। তখন এটা তার সম্পর্কে বলা যায় যে আপাত স্থিরভাবই তার কর্ম। আমি সেদিকেই যাবার চেষ্টা করছি।

আমি কি বীরের অহিংসা আয়ত্ত করতে পেরেছি? আমার মৃত্যুতেই সেটা বোঝা যাবে। যদি কেউ আমাকে হত্যা করে—আর আমি যদি সেই হত্যাকারীর জন্য প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করতে করতে মারা যাই, এবং আমার আত্মার অন্তস্থলে ভগবানের অস্তিত্ব এবং চেতনা অনুভব করি, তবেই বলা যাবে আমার অহিংসা বীরের অহিংসা।

আমি আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে অসাড় করে, পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে চাইনা। একজন গুপ্তঘাতক আমার জীবন সংহার করতে পারে। আমি সেরকম মৃত্যুকে সাদর আহ্বান জানাব। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আমি ভালবাসব আমার বিলীন হয়ে যাবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের কর্তব্য করে যেতে।

আমি যদি কোনো দুরারোগ্য অসুখে ভুগতে থাকি—এমন কি আমার যদি একটা ফোড়া কিংবা ফুসকুড়িও হয় তাহলে আপনাদের কর্তব্য হবে পৃথিবীকে জানিয়ে দেওয়া যে আমি যেমন দাবি করি আমি ভগবানের লোক, তা সত্য নয়। আপনারা তা করলে আমার আত্মা শান্তি পাবে। আপনারা এটাও লিখে রাখুন যে যদি কেউ আমাকে বুলেট বিঁধিয়ে খুন করে—যেমন সেদিন কেউ আমাকে বোমা ফেলে খুন করতে চেষ্টা করেছিল—আর যদি সে বুলেটের আঘাতে আমি না কাতরাই, আর যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে

করতে আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে, কেবল তখনই আমার দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হবে।*

আমার মৃত্যুর পর ঠিক আমার মত কাউকে পাওয়া যাবে না, তবে আমার ছোটখাট অংশ আপনাদের অনেকের মধ্যেই রয়ে যাবে। প্রত্যেকেই যদি আদর্শকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পেছনে থাকেন, তাহলেই আমার অভাবের অনেকখানিই আর থাকবে না।

আমার বন্ধুরা আমাকে সবচেয়ে বেশী সম্মান দিতে পারেন যদি তাঁরা আমার কর্মসূচীকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন, কিংবা যদি এসব কর্মসূচীকে বিশ্বাস না করেন তাহলে এগুলির প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। যে যুগে কর্মই ধর্ম সে যুগে অন্ধ ভক্তির কোনই মূল্য নেই, অনেক সময়েই তাতে বিব্রত হতে হয় আর তা বেদনাদায়কও বটে।

আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে চাইনা। তবে যদি আমাকে আবার জন্মাতেই হয় তাহলে আমি যেন একজন অস্পৃশ্য হয়েই জন্মাই—তাহলে আমি তাদের দুঃখকষ্টের ভাগী হতে পারব—তাদের যে ভাবে অপমান করা হয় সে অপমান আমি গ্রহণ করতে পারব তাহলেই আমি সেই হীন অবস্থা থেকে নিজেকে এবং তাদের মুক্ত করবার চেষ্টা করব। আমি অতএব প্রার্থনা করি যে আমার যদি পুনর্জন্ম হয় তবে আমি যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র হয়ে না জন্মে, অতিশূদ্র হয়ে জন্মাই।

---

* একথা ২৯শে জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে উচ্চারিত হয়েছিল—তিনি গুলিবিদ্ধ হবার ২০ ঘণ্টারও কম সময় আগে।

৪। সমস্ত ধর্মের আত্মা অভিন্ন

বিশ্বাস ছাড়া এই পৃথিবী এক মুহূর্তও টিকবেনা। সত্যিকারের বিশ্বাস হল প্রার্থনা এবং প্রায়শ্চিত্ত দিয়ে যিনি নিজের জীবনকে অমলিন করেছেন তাঁরই চিন্তা এবং বিচারের অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নেওয়া। অতএব, বিশ্বাস ব্যপারটা প্রাচীন যুগের কোনো সত্যদ্রষ্টা বা অবতারের কোনো অকারণ কুসংস্কার নয়, বিশ্বাস হল অন্তরের ক্ষুধার তৃপ্তি।

কোন কোন ব্যাপার আছে যেখানে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বেশী দূর এগুনো যায়না। সেখানে আমাদের বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করতেই হয়। সেখানে কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে বুদ্ধি বিবেচনার কোন সংঘাত নেই, বরং বিশ্বাস সেখানে বুদ্ধি বিবেচনাকে অতিক্রম করে যায়। বিশ্বাস অনেকটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মত—এটা ঠিক বুদ্ধি বিবেচনার অন্তর্গত নয়।

আমি বুদ্ধি বিবেচনাকে অবদমিত করবার পরামর্শ দিতে চাইনা—আমি চাই আমাদের অন্তরের ভেতরের সেই জিনিসটাকে মেনে নিতে, যা কিনা বুদ্ধি বিবেচনাকেই পবিত্র করে তোলে।

বিশ্বাস একটা কমনীয় ফুল নয়—সামান্য একটু ঝড় এলেই তা ঝরে পড়েনা। বিশ্বাস হল হিমালয় পর্বতের মত—যা প্রায় কোনক্রমেই বদলায়না। কোন ঝড়ই হিমালয় পর্বতের ভিত টলাতে পারেনা··· আমি চাই আপনারা সকলেই ভগবান এবং ধর্মে ঐরকম বিশ্বাস রাখুন।

ধর্ম বলতে আমি আনুষ্ঠানিক ধর্ম বা প্রচলিত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ মনে করি না—আমার কাছে ধর্ম হল সমস্ত ধর্মের মূলকথা, যা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে প্রত্যক্ষ করায়।

বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের সমস্ত রকম কার্যকলাপের মধ্যেই ধর্মের প্রবেশ প্রয়োজন। এখানে ধর্মের অর্থ বিভেদ সৃষ্টি নয়। এর অর্থ হল সমগ্র বিশ্বের সুসংহত নীতিপূর্ণ রাজত্বে বিশ্বাস করা। এ অদৃশ্য, কিন্তু তা বলে অবাস্তব মোটেই নয়। এই ধর্ম হিন্দুধর্ম, ইসলাম এবং খৃষ্টান ধর্মকে উন্নততর করে। এই ধর্ম অন্য ধর্মকে বাতিল করেনা। সমস্ত ধর্মকে এই ধর্ম এক সুরে বেঁধে বাস্তব করে তোলে।

অনেক ধর্মের অনেক পথ একই কেন্দ্রে মিলিত হয়। কি এসে যায় যদি আমরা ভিন্ন পথের পথিক হই—আর পৌঁছুই সেই একই লক্ষ্যে ?

সহ্য করা কথাটা আমার পছন্দই নয়, কিন্তু এর চাইতে ভাল কথা আমার চিন্তায় আসছে না।

এই কথাটায় অন্য ধর্ম বিশ্বাসকে নিজের ধর্ম বিশ্বাসের চাইতে খাটো করা হয়—অন্য ধর্মকে যেন কৃপার চোখে দেখা হয়। কিন্তু অহিংসা কথাটা তা নয়—অহিংসা অন্য ধর্মকেও আমাদের নিজেদের ধর্মের মত শ্রদ্ধা জানায়। এতে নিজেদের ধর্মের ত্রুটিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। যিনি সত্য অনুসন্ধান করেন—যিনি প্রেম দ্বারা পরিচালিত হন তিনি সহজেই ত্রুটি স্বীকার করতে পারেন। আমাদের সামনে যদি সমগ্র সত্য উদ্ভাসিত হত তাহলে আমরা কেবলমাত্র সত্যানুসন্ধানী হয়েই থাকতাম, আমরা ভগবানের সঙ্গে একীভূত হতাম, কারণ সত্যই ভগবান। কিন্তু কেবলই সত্যাসন্ধানীত্ব

হওয়াতে, আমরা কেবলই অনুসন্ধান চালিয়ে যাই আর আমাদের ত্রুটিগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। আর আমাদের যদি ত্রুটি থাকে, তাহলে আমাদের ধ্যান ধারণা দিয়ে তৈরী ধর্মও ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ধর্ম আমাদের কল্পনায় আসেনা, যেমন আমরা অনুভব করতে পারিনা ভগবানকে। আমাদের তৈরী ধর্ম, যেহেতু তা ত্রুটিপূর্ণ, সর্বদাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। আর মানুষের তৈরী সমস্ত ধর্মই যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সে প্রশ্ন আসেনা। সমস্ত বিশ্বাসই সত্যকে প্রকাশ করে—কিন্তু প্রত্যেকটি বিশ্বাসই ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় প্রত্যেকেরই ভুল করবার সম্ভাবনা। অন্য ধর্মের প্রতি ভক্তি থাকার মানে এই নয় যে সে ধর্মের ত্রুটিকেও অন্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের ধর্মেরও ত্রুটিকে খুঁজে বার করা।—কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগ না করে, তার ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করে নেওয়ার দিকে মন দেওয়া উচিত। সমস্ত ধর্মকে একই দৃষ্টিতে দেখলে আমরা যে কেবল ইতস্তত করবনা তাই নয়, আমরা অন্য ধর্মে যে সমস্ত গ্রহণযোগ্য গুণ রয়েছে, সেগুলোকে আমাদের ধর্মের অঙ্গীভূত করাকে কর্তব্য বলে মনে করব।

তখন প্রশ্ন আসে ঃ তাহলে জগতে এত বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে কেন? আত্মা এক, কিন্তু আত্মা যেসব দেহকে চঞ্চল করায় তা বহু। আমরা বহু দেহকে কমাতে পারি না, কিন্তু তবু আত্মার ঐক্য আছে বলে মনে করি। যেমন একটা গাছের গুঁড়ি একটাই থাকে, ডালপাতা থাকে অসংখ্য, সেরকম প্রকৃত নিখুঁত ধর্ম থাকে একটিই—তবে বহু মানুষের ভিতর দিয়ে তার প্রসার হওয়ায় ধর্মের সংখ্যাও বেড়ে যায়। পরমধর্মকে বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ত্রুটিপূর্ণ, মানুষ তারা তাদের ভাষায় যতখানি সম্ভব তা প্রকাশ করে—আর অন্যেরা যারা নিজেরাও ত্রুটিপূর্ণ, সেই কথাগুলো ব্যাখ্যা করে।

এখন কোন ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে মানা যায়? প্রত্যেকেই তাঁর নিজের দিক থেকে সঠিক—কিন্তু এও অসম্ভব নয় যে প্রত্যেকেই ভুল করছে। এইজন্যই সহনশীলতার প্রয়োজন—তার মানে এই নয় যে নিজের ধর্ম বিশ্বাসে উদাসীন হতে হবে, বরং এর অর্থ হল নিজের বিশ্বাসের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ভালবাসা। সহনশীলতা আমাদের আত্মার অন্তরকে উদ্ভাসিত করে—উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর যে দূরত্ব, ধর্মান্ধতা থেকে সহনশীলতার দূরত্বও ততখানি। ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান নানা ধর্মের বাধা নিষেধকে ভেঙে দেয়।

অন্যের ধর্ম সম্পর্কে সহনশীলতা আমাদের নিজের ধর্মের মর্ম বুঝতে সাহায্য করে। সহনশীলতা পাপ পুণ্য, সৎ এবং অসতের পার্থক্যকে দূর করে না। এখানে আমি স্বভাবতই পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের কথাই বলছি। সে সমস্ত ধর্মের মূলে কিন্তু কোনো বিভেদ নেই। প্রত্যেকটি ধর্ম থেকেই মহাসন্তের জন্ম হয়েছে।

আমি পৃথিবীর বড় বড় ধর্মের মধ্যে মৌলিক সত্য আছে বলে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি সে সত্য ভগবানের দান। আমি আরো বিশ্বাস করি যে যাঁদের জন্য এই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের এ ধর্মের প্রয়োজন ছিল। আমরা যদি বিভিন্ন ধর্মপুস্তক পড়তে পারতাম তাহলে দেখতে পেতাম যে সমস্ত ধর্মের গোড়াকার কথা একই, আর প্রত্যেকটি ধর্ম একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

একই ভগবানে বিশ্বাস সমস্ত ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তরের মত। কিন্তু তা বলে আমি মনে করি না যে একদিন সমস্ত পৃথিবীতে একটাই ধর্ম থাকবে। তত্ত্ব অনুসারে, যেহেতু ভগবান একজনই, ধর্মও তাই একটিই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে আমি যত জনকে চিনি তাঁদের কেউই ভগবান সম্পর্কে একমত নন্—প্রত্যেকের ধারণ

বিভিন্ন। অতএব, খুব সম্ভবত, ধর্ম বিভিন্ন মানসিকতায় এবং আবহাওয়ায় বিভিন্ন রকম হবে।

ধর্ম মানুষকে আলাদা করবার জন্য নয়—ধর্মের কাজই হল মানুষের মধ্যে মিলনবন্ধন দৃঢ় করা।

সমস্ত মানুষকেই আমার ভালবাসা উচিত—কেবল ভারতবর্ষের মানুষ নয়, সমস্ত পৃথিবীর, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, তা পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে উন্নত হতে সাহায্য করবে। তা হলে পৃথিবী আজ যা আছে তার চাইতে অনেক বেশী বাসযোগ্য হবে। আমি বলি যথাসম্ভব সহনশীল হওয়া প্রয়োজন, আমি সেই মতই কাজ করে চলেছি। আমি সমস্ত লোককে বলি তাঁরা যেন পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে সেই ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেন। আমার ধ্যানের ভারতবর্ষে সকলেই হিন্দু হয়ে যাক তা চাইনা, বা পুরো খৃষ্টান বা মুসলমান হয়ে যাক তাও না, তবে আমি চাই সকলেই যেন পুরো সহনশীল হয়ে উঠুক। পাশাপাশি সকল ধর্মের কাজই চলুক।

আজ সমস্ত ধর্মকে এক করবার প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা। আমরা মৃতের সাম্য চাই না, আমরা চাই বিপরীতের মধ্যেকার ঐক্য। যদি বহুকালকার রীতি, বংশগত বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া ইত্যাদিকে উড়িয়ে দেওয়া হয় বা অমান্য করা হয় তাহলে কেবল তা যে ব্যর্থ হবে তা নয়, তা হবে একটা বিরাট অন্যায়ও। সমস্ত ধর্মের আত্মা এক হলেও তা বিভিন্ন রকম আধারে রক্ষিত আছে। ঐ আধারগুলি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাইরের আধারকে গ্রাহ্য করলেই দেখতে পাবেন ভেতরের আত্মা সেই একই, কেবল তা বিভিন্ন খোলসের মধ্যে রয়েছে। হিন্দুরা

যদি মনে করেন যে ভারতবর্ষে কেবল হিন্দুধর্মই থাকবে, খৃষ্টান, মুসলমান বা জরাথুষ্ট্র ধর্মের স্থান এদেশে নেই তাহলে সে চিন্তা হবে মুসলমানদের সমস্ত পৃথিবীকে মুসলমান শাসনে আনবার মতই ব্যর্থ। কিন্তু যদি ইসলাম একই ভগবানে বিশ্বাস করে এবং সেই ধর্মের মহাপুরুষগণের সন্তানসন্ততি যদি চিরকালই সেই ধর্মে বিশ্বাস রাখে, তাহলে আমরাও মুসলমান, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা হিন্দু এবং খৃষ্টানও। সত্য কোনো ধর্মপুস্তকেরই একচেটিয়া ব্যাপার নয়।

আমরা আমাদের খৃষ্টান বলতে পারি—হিন্দু কিংবা মুসলমানও বলতে পারি। আমরা আমাদের যাই বলিনা কেন, এই বিভিন্নতার মধ্যে একটা ঐক্য আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও একটি ধর্মই আসলে বিরাজ করছে। অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে পেরেছি, কোন না কোন সময়ে আমরা মুসলমান, খৃষ্টান বা হিন্দুরা দেখেছি যে আমাদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই বেশী।

আমার কাছে, হিন্দুধর্ম যতখানি মূল্যবান অন্য সমস্ত ধর্মও ততখানি। ধর্মান্তরের কথা আমার মনে স্থানই পায় না। আমরা একজন হিন্দুকে আরো ভাল হিন্দু হতে সাহায্য করব। একজন মুসলমানকে আরো ভাল মুসলমান হতে এবং একজন খৃষ্টানকে আরো ভাল খৃষ্টান হতে সাহায্য করব। আমাদের যেন এ গোপন গর্ব কখনো মনে স্থান না পায় যে আমাদের ধর্মই অধিকতর সত্য আর অন্যদের ধর্ম অতখানি সত্য নয়। অন্য সমস্ত ধর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যেন পরিষ্কার এবং আন্তরিক হয়। অন্যের জন্য প্রার্থনায় আমরা যেন না বলি, "হে প্রভু তাকে আলো দাও—যে আলো তুমি আমাকে দিয়েছ।" তার বদলে যেন আমরা বলি, "তাকে সবচেয়ে ভাল হবার জন্য যত আলো যত সত্য প্রয়োজন

তা দাও।" কেউ যদি নিজের ধর্মের লেবেল বদলাতে চায় (ধর্মান্তরিত হওয়া) তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, তবে তাদের এরকম আচরণ দেখলে আমি দুঃখিত হব।

হিন্দুধর্ম কতকগুলি লোকের জন্য বিশেষ ধর্ম নয়। এই ধর্মে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীয় মহাপুরুষদের পূজো করবার স্থান রয়েছে। সাধারণভাবে আমরা যাকে ধর্মপ্রচার বলে জানি এ ধর্ম তা করেনা। নিঃসন্দেহে এই ধর্মে নানা জাতি বা উপজাতিকে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এই গ্রহণ বিবর্তনমূলক, প্রায় নিঃশব্দে সেটা হয়েছে। হিন্দুধর্ম প্রত্যেককে তার খুশীমত, বিশ্বাস ও ধর্ম মত ভগবানকে আরাধনা করতে বলে, ফলে এর সঙ্গে কোন ধর্মের শত্রুতা নেই।

যদিও আমি সঙ্কীর্ণ অর্থে খৃষ্টান নই, তবু যীশুখৃষ্টের শাস্তিভোগের দৃষ্টান্ত আমাকে অহিংসাধর্মে বিশ্বাস করার উপাদান যুগিয়েছে। এই অহিংসাই আমার সমস্ত রকম পার্থিব কর্মের প্রেরণা।

মুসলমান ধর্ম অনুপ্রেরণার ফল বলে আমি মনে করি, পবিত্র কোরাণকেও আমি মনে করি প্রেরণা সম্ভূত, এবং মহম্মদকে মনে করি একজন ধর্মীয় মহাপুরুষ।

বেদকে ধর্মের একমাত্র উৎস বলে আমি মনে করিনা। আমি বাইবেল, কোরাণ এবং জেণ্ড আভেস্টাকে বেদের মতই প্রেরণামূলক বলে মনে করি। হিন্দু ধর্মপুস্তকের সমস্ত কথা, সমস্ত মন্ত্র ভগবানের বাক্য বলে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। যত পাণ্ডিত্যপূর্ণই হক না কেন, যদি নীতি বিগর্হিত হয় তাহলে সে ব্যাখ্যা আমি মেনে নিইনা।

যা লেখা আছে তা আমি হুবহু মানতে পারি না। সেজন্য পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম পুস্তকের মর্মকথা আমি বুঝতে চেষ্টা করি। আমি

সত্য এবং অহিংসার কষ্টিপাথরে সেগুলো যাচাই করে দেখি, সেভাবেই তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করি। যাচাই করে যেগুলো অসঙ্গত মনে হয় সেগুলো আমি বাতিল করে দিই—আর সঙ্গত সমস্তগুলিকেই আমি গ্রহণ করি।

সত্য এবং ন্যায়ের চাইতে বড় ধর্ম আর নেই।

একজন যদি তার নিজের ধর্মের হৃদয়ে পৌঁছতে পারে তবে সে অন্য সমস্ত ধর্মের হৃদয়েও পৌঁছতে পারবে। কারণ নীতি বিগর্হিত কোন ধর্ম অনুশাসনকেই আমি মানিনা। যে সমস্ত ধর্মের মধ্যে কোনো যুক্তি নেই তা আমি মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু যেখানে নীতি নেই তা আমি মানতে পারি না।

যখনি আমাদের কাছ থেকে নীতি দূরে চলে যায় তখনি আমরা হয়ে পড়ি অধার্মিক। নীতির বাইরে কোনো ধর্মেরই যাবার অধিকার নেই। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, মানুষ যখন মিথ্যে কথা বলে, নিষ্ঠুর এবং অমিতাচারী হয় তখন ভগবান তার পড়ে আছেন একথা সে বলতে পারে না।

আমরা তখনি আর বাড়তে পারি না যখন আমরা দোষ এবং গুণের মধ্যে পার্থক্য খুঁজিনা, যখন আমরা ক্রীতদাসের মত প্রাচীন প্রথার সবটা না বুঝেই মেনে চলি। পুরনো কালের মহান এবং শ্রেষ্ঠ জিনিসের আমরা গর্বিত উত্তরাধিকারী। পুরনো ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমাদের ঐতিহ্যকে অসম্মান করার কোনো প্রয়োজন নেই।

যেখানে ভয় রয়েছে সেখানে ধর্মের স্থান নেই। নির্ভীক হওয়ার অর্থ এই নয় যে একগুঁয়ে বা হিংস্র হতে হবে। সেরকম হলেই

বুঝতে হবে ভয় হয়েছে। নির্ভীক হওয়ার শর্তই হল শান্ত থাকা এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখা। এজন্য ভগবানের প্রতি বিশ্বাস প্রাণবন্ত হওয়া উচিত।

আমি একাধারে মূর্তিপূজারী এবং কালাপাহাড়—এই কথাগুলির প্রকৃত অনুসারে আমি তাই। মূর্তিপূজার পেছনে যে মানসিকতা রয়েছে তার মুল্য আছে বলে আমি মনে করি। মানব জাতিকে উন্নত পথে নিয়ে যাবার পক্ষে এটি সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্যাপার। আমি আমাদের এই দেশের হাজার হাজার পবিত্র মন্দিরকে আমার জীবন দিয়েও রক্ষা করবার মত ক্ষমতা পেতে চাই।

আমি আর এক হিসেবে কালাপাহাড়, কারণ আমি সেই সব মূর্তিকে ভাঙ্গি আসলে যেগুলো ধর্মোন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়। যারা নিজের ধর্ম ও দেবমূর্তি ছাড়া আর কোনরকম দেবমূর্তি পূজোকে ভাল বলে মনে করতে পারে না। এক টুকরো পাথর বা সোনা দিয়ে তৈরী দেবমূর্তি, যা ধরা ছোঁয়া যায় সেরকম মূর্তি পূজোর চাইতে মারাত্মক হল এ ধরনের সূক্ষ্ম এবং ধরা ছোঁয়া যায়না এমন ধরনের পূজো।

আমি মনে করিনা যে মন্দিরের অস্তিত্বের মধ্যে কুসংস্কার আছে বা পাপ আছে। মনে হয়, কোন একরকম সাধারণ ভজনা বা ভজনালয় মানুষের বিশেষ প্রয়োজন।

একজন প্রচণ্ড ভক্ত হিন্দু আমার কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন শান্তভাবে, আমি তারই জবাবে এগুলি লিখছি। তাঁর প্রশ্ন ছিল ঃ "আপনি তো আপনার আশ্রমে 'কলমা'কে স্থান দিয়েছেন। হিন্দুধর্মকে হত্যা করবার আর কি বাকী রইল ?"

আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার হিন্দুত্ব এবং আমার আশ্রমের অন্যান্য হিন্দুরা এরফলে লাভবানই হয়েছেন। আমাদের মধ্যে সমস্ত রকম ধর্মের প্রতি সমান ভক্তি থাকা প্রয়োজন। যখনি বাদশা খান এখানে আসেন এখানে অতি আনন্দের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দেন। তিনি রামায়ণ যে সুরে গাওয়া হয় তা বেশ পছন্দ করেন, আর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি গীতা পাঠ শোনেন। এরফলে তাঁর ইস্‌লামের প্রতি ভক্তি কিছু কমেনি। তাহলে, আমিই বা কেন একই রকম ভক্তির সঙ্গে, কোরাণ পাঠ অন্তরের সঙ্গে শুনতে পারব না?

রামের কেবল হাজারটা নাম নেই। তাঁর নাম অসংখ্য—আর তিনি সেই তিনিই, তাঁকে আল্লা, খুদা, রহিম, রজ্জাক, অন্নদাতা বা ভক্তের হৃদয় থেকে যে নামই দেওয়া হক না কেন।

আমি বিশ্বাস করি প্রার্থনা হচ্ছে ধর্মের প্রাণ এবং সার, আর তাই মানুষের জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, কেননা ধর্মছাড়া কেউ বাঁচতে পারেনা। কেউ কেউ আছেন যাঁরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হওয়ায় বলে থাকেন যে তাঁদের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এ যেন বলা যে একজন লোক নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু তার নাক নেই।

যিনি প্রার্থনা করেন তিনি নিজেও শান্তিতে থাকেন, আর পৃথিবীর সঙ্গেও তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয় না। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যে মানুষের হৃদয়ে প্রার্থনা নামক বস্তুটির অভাব তাঁর হৃদয় দুঃখে ভরে ত যায়ই. পৃথিবীকেও ইনি দুঃখে ভরে ফেলেন। প্রার্থনা করতে হয় মৃত্যুর পরবর্তী কালের জন্য তো বটেই, এমনকি এই জগতে বেঁচে থাকতে গেলেও প্রার্থনার মূল্য অপরিসীম। প্রার্থনা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে শান্তি, স্থৈর্য্য এবং নিয়মানুবর্তিতা আনতে অপরিহার্য।

আমি স্বীকার করি একজন মানুষ যদি দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করেন তাঁর আর আলাদা করে প্রার্থনা করবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে এরকম করা অসম্ভব। এই ইতরামিতে ভরা দুনিয়ায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় দুর্বিষহ। তাঁরা যদি বাইরের জিনিস থেকে তাঁদের মনকে আলাদা করে নিতে পারেন—প্রতিদিন কয়েক মিনিটের জন্যও যদি তা করা যায়, তাহলেও তার মূল্য অপরিসীম হবে। ভগবানের নীরব সান্নিধ্য তাদের এক অখণ্ড শান্তি এনে দিতে, রাগকে দমাতে এবং ধৈর্য্যশীল হতে সাহায্য করবে, নানা অশান্তির মধ্যেও।

আমি যা বলছি তা রূপকথা নয়। আমি কাল্পনিক ছবি আঁকছিনা। যে সমস্ত মানুষ প্রার্থনার সাহায্যে তাঁদের উন্নতির পথে নানা বাধাকে জয় করে এগিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার সার বর্ণনা করেছি। তার সঙ্গে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা যোগ করছি, সেটা হল, আমার জীবনপথে যতই এগুচ্ছি ততই আমি অনুভব করছি আমার কাছে বিশ্বাস এবং প্রার্থনা একই ব্যাপার। আমি আমার কয়েক ঘণ্টা, দিন বা সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে কথাটা বলছিনা—আমি বলছি একটানা চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে। আমার জীবনে অনেক হতাশা এসেছে, প্রচণ্ড অন্ধকার নেমে এসেছে, চরম পন্থা অনুসরণ করবার, সাবধান হবার উপদেশ আমাকে শুনতে হয়েছে, অতি সূক্ষ্মভাবে গর্ব আমাকে আঘাত হেনেছে ; কিন্তু আমি জানি আমার বিশ্বাস, প্রচণ্ড কিছু নয়, আমি যতখানি চাই তার চাইতে এর পরিমাণ অনেক কম, কিন্তু তবু, এই সামান্য বিশ্বাসই আজ পর্যন্ত আমার বহুবিধ অসুবিধা দূর করেছে।

আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের বিলীন করতে পারব ততক্ষণ আমাদের মধ্যেকার পাপ দূর হবে না। ভগবান পুরোপুরি

আত্মসমর্পণ চান—তার বদলে তিনি দেন সত্যিকারের স্বাধীনতা। আর যখন এভাবে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে তখন সে সমস্ত জীবের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত দেখতে পায়। তার কাছে তখন এটা আনন্দের ব্যাপার এবং উপভোগের ব্যাপার হয়ে ওঠে। তার নতুন জন্মলাভ হয়—ভগবানের সৃষ্ট জীবজগতকে সেবা করতে সে কখনো ক্লান্তিবোধ করে না।

অতএব, আপনি আপনার দিন একটি প্রার্থনা দিয়ে শুরু করুন—সেটা এমন আন্তরিকতার সঙ্গে করুন যাতে তার রেশ সন্ধ্যে পর্যন্ত বজায় থাকে। দিনটাকে শেষও করুন আর একটি প্রার্থনায় যাতে রাত্রে শান্তি বিরাজ করে, কোনো স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন এসে আপনাকে তাতে বিঘ্ন ঘটাবেনা। কিভাবে প্রার্থনা করবেন তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। যে কোন ভাবেই হক, প্রার্থনা করুন তবে এমন ভাবে তা করতে হবে যাতে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারেন। কেবল এটা দেখতে হবে যে, প্রার্থনার কথা উচ্চারণের সময় যেন অন্তর্নিহিত বক্তব্যটা হারিয়ে না যায়।

নিজের প্রতি বাধা নিষেধ আরোপ করাটার মধ্যে বাধ্যবাধকতা কিছু নেই। যে লোক কোনোরকম বাধা নিষেধের মধ্যে থাকতে চায়না, যথেচ্ছাচার করে, সে আবেগের ক্রীতদাসে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে যে কতকগুলি বাধা নিষেধকে মেনে নেয় সেই সহজ এবং মুক্তভাবে থাকতে পারে। জগতের সমস্ত কিছুই—এমনকি সূর্য চাঁদ নক্ষত্র পর্যন্ত কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে। এরকম কতকগুলো নিয়ম না মেনে চললে পৃথিবী এক মুহূর্তও টিকত না। আপনি যদি কোনো বাধা নিষেধের বশবর্তী না হন, কোনো নিয়ম না মেনে চলেন তাহলে আপনি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবেন। প্রার্থনা আত্মার নিয়মানুবর্তিতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মানুবর্তিতা এবং

সংযমই আমাদের সঙ্গে পশুকে পৃথক করেছে। আমরা যদি মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দিতে চাই, মাথা সোজা করে চলতে চাই, চারপায়ে ভর দিয়ে নয়, তাহলে যেন আমরা সেটা বুঝে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে সংযম এবং নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস করি।

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায়কে নিয়ে মুশকিল এই যে, তারা বিজ্ঞান আর আধুনিক দর্শন পড়বার পর তাদের বিশ্বাস গেছে ভেঙে, আর অবিশ্বাসের আগুনে তারা ছাই হয়ে গেছে।

উত্তর ঃ তার কারণ এই যে তারা বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাসকে বিচার করে, আত্মার অভিজ্ঞতা দিয়ে নয়। জীবন যুদ্ধে বুদ্ধি আমাদের কিছুদূর নিয়ে যায়, কিন্তু সঙ্কট মুহূর্তে আর তাতে কাজ হয়না। বিশ্বাস বিচার বিবেচনাকে ছাড়িয়ে যায়। যখন দিগন্তের আকাশে প্রচণ্ড আঁধার ঘনিয়ে আসে, যখন সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা ধূলায় লুণ্ঠিত হয় তখনি বিশ্বাস সবচেয়ে বেশী উজ্বল হয়ে দেখা দেয় আর আমাদের উদ্ধার করে। আমাদের যুবকসম্প্রদায়ের এরকম বিশ্বাসেরই প্রয়োজন—আর এরকম বিশ্বাস তখনই আসে যখন তারা তাদের শিক্ষার সমস্ত গর্বকে বিসর্জন দিয়ে ভগবানের ইচ্ছের উপর নিজেদের সমর্পণ করে।

বুদ্ধি বিবেচনার চাইতে অনেক বিরাট কিছু আমাদের এবং অবিশ্বাসীদের চালনা করে। তাদের অবিশ্বাস বা সন্দেহ তাদের জীবনের সঙ্কট মূহূর্তে কোন কাজে আসে না। তাদের আরো ভাল কিছু প্রয়োজন—তাদের বাইরে থেকে এমন কিছু প্রয়োজন যা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আর তাই, যদি কেউ আমার কাছে এসে একটা ধাঁধা উপস্থিত করে, আমি তাকে বলি ঃ আপনি ভগবানের বা প্রার্থনার অর্থ খুঁজে পাবেন না যতক্ষণ না আপনি নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলে মনে করেন। আপনাকে দীনভাবে

এটা মেনে নিতে হবে যে আপনি যত মহানই হন না কেন, যত প্রচণ্ড জ্ঞানই আপনার থাকুক না কেন, সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি একটা ধূলিকণার মতই ক্ষুদ্র। কেবল বুদ্ধি দিয়ে জীবনের সমস্ত ব্যাপার বিচার করলেই হবেনা, আসলে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে আত্মার হদিশ মেলেনা— অথচ প্রকৃত সন্তুষ্টি তাতেই পাওয়া যায়। এমনকি ধনী ব্যক্তিরাও সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যদিও তাঁদের টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন জিনিসের কোন অভাবই নেই, এমন স্নেহেরও অভাব নেই, কিন্তু তবুও কখনো তাঁদের জীবনেও প্রচণ্ড বিক্ষিপ্ততা আসে। সেইসব মুহূর্তে আমরা এক ঝলক ভগবানকে দেখতে পাই—যিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবন-পথের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই হল প্রকৃত প্রার্থনা।

যদিও রাজনৈতিক দিগন্তের মুখমণ্ডলে কেবল হতাশাই দেখতে পাচ্ছি, আমি কখনো অশান্ত হইনি। সত্যি কথা এই যে আমি এমন লোকের সন্ধান পেয়েছি, যারা, আমি শান্তিতে থাকতে পারি বলে আমাকে ঈর্ষা করেন। আমি আপনাদের বলতে চাই, সেই শান্তি আসে প্রার্থনা থেকে। আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই, কিন্তু আমি দাবী করি আমি একজন প্রার্থনাকারী। আমি আমার ব্যবহারিক কাজের বর্ণনা দিলাম। প্রত্যেকে চেষ্টা করুন, দেখুন দৈনন্দিন প্রার্থনা করার ফলে আপনার জীবনে রোজই নতুন কিছু যুক্ত হচ্ছে। সেই নতুন জিনিসের সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা করা চলেনা।

৫। দরিদ্রনারায়ণ

ভগবানকে মানুষ বুঝতে পারেনা, ভগবান নামহীন, তাই মানুষ তাঁকে বহু লক্ষ লক্ষ নামে ডাকে, দরিদ্র নারায়ণ নামটি সেগুলির একটি মাত্র। এর অর্থ হল দরিদ্রের ভগবান, দরিদ্রের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব।

আমি আমার দেশের বহু লক্ষ লক্ষ লোককে চিনি বলে দাবি করি। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই আমি তাদের সঙ্গে কাটাই। তারাই আমার কাছে প্রধান, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কেননা ভাষাহীন জনসাধারণের হৃদয়ের ভগবানকেই আমি একমাত্র ভগবান বলে মানি। তারা হয়ত ভগবানের অস্তিত্ব বুঝতে পারেনা, আমি পারি। আর আমি লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের সেবার ভিতর দিয়ে তাঁকেই উপাসনা করি যিনি সত্যরূপী ভগবান, কিংবা ভগবানরূপী সত্য।

অভুক্ত এবং অলস লোকেদের কাছে ভগবান, কেবলমাত্র কর্ম এবং বেতন হিসেবে খাদ্যের প্রতিশ্রুতি দিলেই দেখা দিতে সাহসী হন।

কোনো একজনও শক্ত সমর্থ লোক কর্মহীন বা খাদ্যহীন অবস্থায় থাকলে আমাদের বিশ্রাম করতে কিংবা ভাল খেতে লজ্জা পাওয়া উচিত।

তাহলে একবার ভেবে দেখুন ত্রিশ কোটি লোক বেকার হয়ে রয়েছে এই অবস্থাটা কি ভয়াবহ। প্রতিদিন বহু লক্ষ লোক

অপমানিত হচ্ছে কাজের অভাবে—তাদের আত্মসম্মানবোধ নেই, ভগবানের প্রতিও বিশ্বাস নেই। সেই আপামর ক্ষুধিত জনসাধারণ, যাদের চোখ নিষ্প্রভ, যাদের কাছে রুটিই একমাত্র দেবতা, তাদের কাছে ভগবানের বাণী শোনানোও যা, ওখানকার একটা কুকুরের কাছে ভগবানের বাণী শোনানোও তাই। আমি তাদের কাছে ভগবানের বাণী মাত্র একভাবেই পৌঁছে দিতে পারি আর তা হল পবিত্র কাজের কথার মাধ্যমে। সকালে উঠে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে—আবার দুপুরের খাওয়াটা ভাল হবে এটা জানার পর ভগবান নিয়ে আলোচনা করাটা খুবই সোজা। কিন্তু আমি কেমন করে অগণিত ক্ষুধিত নরনারীর কাছে ভগবানের কথা শোনাতে যাব—যারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না? তাদের কাছে ভগবান রুটি এবং মাখন রূপেই দেখা দেন। গরীবের পক্ষে পয়সাকড়ির ব্যাপারটাই আত্মার চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের কাছে আধুনিক প্রগতির কথা বলুন। তাদের কাছে বৃথা ভগবানের নাম করে তাদের অপমান করুন। তাদের কাছে ভগবানের নাম করলে তারা আপনাকে আমাকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বলেই ভাববে। তারা যদি কোনো ভগবানকে জেনেই থাকে তবে তিনি হলেন ভীতি, প্রতিশোধ এবং দয়ামায়াহীন অত্যাচারের প্রতিমূর্তি।

বহু বছর আগে আমি একটি কবিতা পড়েছিলাম—তাতে বলা হয়েছিল যে কৃষকেরাই পৃথিবীর স্থষ্টিকর্তা। ভগবান আহার যোগাবার কর্তা হলে কৃষক তাঁর হাতের মত। কৃষকের কাছে আমাদের যে ঋণ তা কেমন করে শোধ করব? এ পর্যন্ত আমরা তো কৃষকের পরিশ্রমেরই ফলভোগ করেছি!

সবচেয়ে সেরা নিয়ম হল—কোটি কোটি লোক যা পাচ্ছেনা তা গ্রহণ না করা। প্রত্যাখ্যান করবার শক্তি হঠাৎ আয়ত্ত করা

যায়না। প্রথমেই প্রয়োজন মনের সেই শক্তিকে চর্চা করা—যে শক্তি বহু লক্ষ লোককে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এমন অধিকার বা সুবিধা ভোগ করতে চায়না। আর তার পরের কাজ হল আমাদের জীবনকে নতুন ভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এরকম মনোভাবের সঙ্গে মিলিয়ে মানিয়ে নেওয়া।

প্রচণ্ড এবং রক্তাক্ত বিপ্লব একদিন সুনিশ্চিত যদি স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য ত্যাগ করা না হয়, যদি না সেগুলিকে প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য ভাগ করে নেওয়া হয়।

এখন চলছে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অসাম্য—সমাজবাদের মূল কথাই হল অর্থনৈতিক সাম্য। এরকম অন্যায় অসাম্য—যেখানে কয়েকজন ঐশ্বর্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর যেখানে আপামর জনসাধারণের ভাগ্যে ঠিকমত খাদ্য জুটছেনা, সেখানে রামরাজ্য হওয়া সম্ভব নয়।

আমার কাছে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হল প্রত্যেকটি মানুষের উন্নতি, সে নারী হক বা পুরুষ হক তাদের নিজেদের সজ্ঞান চেষ্টার ফলে যা সম্ভব।

সেই সমাজে সমস্ত পুরুষ এবং মহিলা পাবে যথেষ্ট পরিধেয় বস্ত্র—শুধুমাত্র লেংটি নয়, যে পরিধেয় বস্ত্র আমরা ভদ্র মনে করি সেরকম, যথেষ্ট খাদ্য, যার মধ্যে থাকবে দুধ এবং মাখন—আজকাল লক্ষ লক্ষ লোক এসব থেকে বঞ্চিত।

আমার মতে ভারতবর্ষের—কেবল ভারতবর্ষের কেন, পৃথিবীর শাসনতন্ত্র এমন হওয়া উচিত, যাতে কোনো লোকেরই খাদ্য এবং বস্ত্রের অভাবে যেন কষ্ট না হয়। অন্য কথায়, প্রত্যেকের জন্যই

যেন কাজ করবার মত যথেষ্ট সুযোগ থাকে যাতে তাদের কোনো অভাব না থাকে। এরকম ব্যাপার করা সম্ভব তখনি যখন অপরিহার্য জিনিষগুলো উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে জনসাধারণের হাতে। এগুলো ভগবানের দেওয়া জল বাতাসের মতই সহজে পাওয়া যাবে, না পাওয়া গেলেও পাওয়া উচিত। এইসব উৎপাদনের রথ যেন অন্যকে শোষণ করবার জন্য ব্যবহৃত না হয়। এইসব জিনিসের একচেটিয়া কর্তৃত্ব কোনো দেশ, জাতি বা কতকগুলি লোকের কাছে থাকাটা অন্যায়। এই সহজ নীতি না মেনে নেবার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অসুখী দেশে তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও লোকেরা সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছে।

আমাকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে আমি অর্থনীতি এবং সুনীতির মধ্যে কোনো বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই না। যে অর্থনীতি কোন ব্যক্তি বা দেশকে নীতিভ্রষ্ট করে সে অর্থনীতি অন্যায় এবং পাপে ভরা। তাই যে অর্থনীতিকে অন্য দেশ আক্রমণ করে পুষ্ট হতে হয় সে অর্থনীতিও অন্যায়।

প্রকৃতিতে একথা ঠিক বলেনা যে প্রতিটি মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন কিংবা সমান। যেমন, জন্মের সময় প্রত্যেকেরই একরকম বুদ্ধি হয় না। কিন্তু সাম্যবাদের নীতি তখনি প্রতিষ্ঠিত হয় যখন যাদের বেশী বুদ্ধি তারা সে বুদ্ধি দিয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের দাবিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ করে না রাখে।

ধনসঞ্চয় করাটা একটা ঘৃণা এবং অবমাননাকর শিল্প, যদিনা তারসঙ্গে কাজে লাগানোর উপযোগী করে খরচ করার কৌশল জানা থাকে। কেবলমাত্র ধন সঞ্চয় করলেই যে তা অবমাননাকর হবে, পাপ হবে, বা যে ধন সঞ্চয় করে সে লম্পট হবে, তা ঠিক নয়।

"আপনি কোটি কোটি টাকা রোজগার করুন, তাতে আপত্তি নেই। তবে একটা জিনিস বুঝতে হবে, আপনার ধন আপনার নয়; এর মালিক হল জনসাধারণ। আপনি তা থেকে যা আপনার ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন তা নিন, বাকিটা রাখুন সমাজের জন্য।" এই উপদেশ কেউ আজ পর্যন্ত মানেন নি। বণিকশ্রেণী যদি এই দুঃসময়ে এই উপদেশ না শুনে চলতে মনস্থ করেন তাহলে তাঁরা তাঁদের ঐশ্বর্যের এবং আবেগের ক্রীতদাস হয়ে থাকবেন এবং অবশেষে তাঁদের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে তাঁদের কাছে যাঁরা জোর করে এসব কেড়ে নেবেন।

আমি সর্বদাই বলেছি যে বণিক এবং শ্রমিক শ্রেণী পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হওয়া উচিত এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত। তাঁরা সকলে মিলে একটা বিরাট পরিবার গড়ে তুলবেন যেখানে থাকবে ঐক্য এবং মিল। বণিকশ্রেণী যে কেবলমাত্র শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং খাওয়াপরার ব্যবস্থা করবেন তা নয়, তাদের নীতিগত উন্নতির ব্যবস্থাও করবেন; শ্রমিকদের মঙ্গল-সাধনই হবে পুঁজিপতিদের লক্ষ্য—শ্রমিকরা থাকবেন পুঁজিপতিদের জিম্মায়।

কিছু কোটিপতি ধ্বংস করে ফেললেই যে দরিদ্র শোষণ বন্ধ হবে তা নয়। দরিদ্রের অশিক্ষা দূর করে তাদের শোষণকারীদের সঙ্গে অসহযোগ করার শিক্ষা দিতে হবে। ফলে শোষণকারীদেরও হৃদয় বদল হবে। আমি এও বলেছি যে শেষ পর্যন্ত এরফলে দুজনে সমান অংশীদার হবে। এমনিতে পুঁজি অশুভ নয়—এর ভুল প্রয়োগেই অশুভ। কোন না কোন ভাবে পুঁজিবাদ চিরকালই প্রয়োজন হবে।

আমি চাই সকলের পদমর্যাদা সমান হক। শ্রমিকশ্রেণী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আলাদা হয়ে রয়েছে—পদমর্যাদার দিক থেকে তারা

ছোট হয়ে রয়েছে। তারা শূদ্র—এই কথাটার মানে হয়েই দাঁড়িয়েছে নিচের তলার লোক। আমি চাইনা একজন তাঁতির ছেলে, একজন কৃষকের ছেলে এবং একজন স্কুল শিক্ষকের ছেলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকুক। একজন শ্রমিকের এটা জানা উচিত যে শ্রমও পুঁজি। যখনি শ্রমিকেরা ঠিকমত শিক্ষা পাবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হবে, যখন তারা বুঝতে পারবে তাদের শক্তি কতখানি, পুঁজির পরিমাণ যাই হক না কেন, তাদের দমিয়ে রাখতে পারবেনা। সঙ্ঘবদ্ধ এবং আলোকপ্রাপ্ত শ্রমিকেরা তাদের শর্ত মেনে চলাতে বাধ্য করতে পারে। কেবল কোন দলের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে কোন লাভ নেই। আমাদের সবল হতে হবে। হৃদয়কে শক্ত করতে হবে, মনকে আলোকপ্রাপ্ত হতে হবে আর কাজ করবার জন্য আগ্রহী হতে হবে। তাহলেই নানারকম বাধা বিপত্তি পথ থেকে দূর হয়ে যাবে।

আমি মনে করিনা পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকের সংঘর্ষের কোন প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। আজ যেটা দরকার সেটা হল পুঁজিপতিরা যেন শ্রমিকদের উপর প্রভুত্ব না খাটায়। আমার মতে, কারখানার শ্রমিক এবং কারখানার শেয়ার যাদের আছে প্রত্যেকেই কারখানার মালিক—আর যখন কারখানার মালিকেরা বুঝবেন যে শ্রমিকরাও কারখানার মালিক তখনি তাঁদের মধ্যে শান্তি ফিরে আসবে।

অহিংসার পথে, আমরা পুঁজিপতিদের ধ্বংস করতে চাইনা—আমরা পুঁজিবাদকেই ধ্বংস করতে চাই। আমরা পুঁজিপতিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শ্রমিকদের জিম্মাদার বলে নিজেদের ভাবতে। একজন পুঁজিপতিকে তাঁর পুঁজি রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের উপরই নির্ভর করতে হয়। পুঁজিপতির মন বদল না হওয়া পর্যন্ত

শ্রমিকদের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যদি পুঁজি শক্তি হয়, তাহলে কাজও শক্তি। দুরকম শক্তিকেই ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে—অথবা ব্যবহার করা যেতে পারে সৃষ্টির জন্যও। একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। যখনি একজন শ্রমিক বুঝতে পারে তার নিজের শক্তির মর্ম তখনি সে আর পুঁজিপতির ক্রীতদাস থাকে না। তার সঙ্গে সেও একজন মালিক হয়ে যায়। শ্রমিক যদি একমাত্র মালিক হতে চায় তাহলে সেই সোনার ডিম পাড়া মুরগীকেই মেরে ফেলা হয়।

যথাস্থানে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে—যন্ত্রপাতি এখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানুষের কাজের বদলে যেন যন্ত্রপাতির ব্যবহার না হয়।

আমার সামান্য এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আছে যে শিল্প ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। আমি তাই তার বিরোধিতা করতে পারিনা, তবে যে শিল্প কেবলি যন্ত্রপাতির সাহায্যে চলে তার প্রতি আমার প্রচণ্ড উদ্বেগ রয়েছে। যন্ত্রপাতি বড়ই তাড়াতাড়ি উৎপাদন করে আর তার সঙ্গে এমন একটা অর্থনীতি গড়ে তোলে যা ঠিক আমার বোধগম্য হয় না। আমি যখন দেখি কোন জিনিস ভাল যতখানি করে মন্দ করে তার চাইতে অনেকখানি বেশী তখন আর তাকে সমর্থন করিনা। আমি চাই আমার দেশের মূক জনসাধারণ সুখী হক, স্বাস্থ্যবান হক, আমি চাই যেন এর সঙ্গে তাদের আত্মার উন্নতিও হক। এখন পর্যন্ত এরজন্য আমাদের যান্ত্রিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। দেশে অনেক, অনেক বেকার আছেন। আস্তে আস্তে যখন বুঝতে পারব যন্ত্রের প্রয়োজন আছে আমরা নিশ্চয় তখনি যন্ত্র ব্যবহার করব। আমরা শিল্প চাই—কিন্তু আগে আসুন আমরা পরিশ্রমী

হই। আমরা আরো বেশী আত্মনির্ভর হতে পারলে অন্যদের অতখানি অনুসরণ করার প্রয়োজন হবেনা। কেবল তখনি আমরা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করব যখন তা না হলে চলবেনা। যখন আমাদের জীবন অহিংসা দিয়ে চালিত হবে তখন আমরা বুঝতে পারব কেমন করে যন্ত্রপাতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এক মুহূর্তের জন্য না হয় ধরেই নেওয়া গেল যে যন্ত্রপাতি মানুষের সমস্ত রকম অভাবকে দূর করবে, তবু সেই অবস্থায় শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে ফলে বিলিব্যবস্থার জন্য নানারকম ঘোরা পথে অগ্রসর হতে হবে—কিন্তু যদি উৎপাদন এবং বিলিব্যবস্থা একই অঞ্চলে হয় তাহলে আপনা থেকেই সমস্ত সুনিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে জাল জুয়াচুরি বা ফাটকাবাজী বন্ধ হয়। যখন উৎপাদন এবং ভোগ একই অঞ্চলে হয় তখন উৎপাদনকে ক্রমাগত যে কোনো উপায়ে বাড়াতে হবে—এমন মতলব আর থাকতে পারেনা। বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা এবং অসুবিধাও আর থাকেনা। প্রচুর উৎপাদন নিশ্চয়ই করা উচিত—তবে জনসাধারণের নিজের নিজের বাড়ীতে—কারখানায় নয়। আপনি যদি ব্যক্তিগত উৎপাদন লক্ষ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন তাহলে কি প্রচুর উৎপাদন হয় না? আপনারা যে প্রচুর উৎপাদন করেন তা করতে কম লোকের প্রয়োজন হয়, আর প্রয়োজন হয় জটিল সব যন্ত্রপাতির। আমি যে যন্ত্রের কথা বলি তাহল অত্যন্ত সরল—যা কিনা কোটি কোটি লোকের ঘরে পৌঁছে দিতে পারি।

"তাহলে আপনি যন্ত্রপাতির বিরোধিতা করেন তখন যখন দেখেন উৎপাদন একটি বিশেষ জায়গায় ঘনীভূত হয় আর তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে মাত্র কয়েকজন?"

ঠিক বলছেন। আমি একচেটিয়া এবং বিশেষ সুবিধে ঘৃণা করি। যে জিনিস জনসাধারণের সঙ্গে ভাগ করা চলেনা তা আমার কাছে পরিত্যাজ্য। আর কিছু নয়।

"আপনি কি ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত করতে চাননা ?"

চাই, তবে আমি আমার নিজস্ব ধারায় তা করতে চাই। আমি গ্রামগুলিকে শিল্পোন্নত করছি অন্যরকমভাবে।

যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে সকলের উপকার হয় এমন প্রত্যেকটি উদ্ভাবনকে আমি মূল্য দিই। কোনো একটি যন্ত্র যখন কোন ব্যক্তি বিশেষকে সাহায্য করে তখন সেই যন্ত্রের স্থান আছে বলে আমি মনে করি। সংস্কৃতি সম্পন্ন এক মানব পরিবারে শ্রমের একটি অসাধারণ স্থান আছে। সাধারণ যন্ত্রপাতি যদি কুটিরবাসী শ্রমিকের ব্যক্তিগত পরিশ্রম লাঘব করে তবে আমি নিশ্চয়ই সেরকম যন্ত্রকে অভ্যর্থনা জানাব।

আমি, যন্ত্রপাতি না হলেই চলবেনা, এরকম উন্মাদনার বিরুদ্ধে—যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে নই। এই উন্মাদনায় তারা বলে এতে শ্রমিকদের শ্রমের লাঘব হবে। এভাবে "শ্রম লাঘব" হতে হতে হাজার হাজার লোক বেকার হয়, খোলা রাস্তার উপর পড়ে পড়ে না খেয়ে মারা যায়। আমি সময় এবং পরিশ্রম দুই-ই বাঁচাতে চাই, তবে সমগ্র মানব জাতির ভেতর থেকে বেছে কয়েকজনের জন্য নয়, সকলের জন্য ; আমি পুঁজির সমাবেশ চাই—তাও কয়েকজনের জন্য নয়, প্রত্যেকের হাতে। আজ যন্ত্রপাতি মাত্র কয়েকজনকে সাহায্য করছে—যে কয়েকজন লক্ষ লক্ষ লোকের ঘাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রম লাঘব করাটার আসল ব্যাপার কিন্তু শ্রমিকদের প্রতি দরদ দেখানো নয়, নিজেদের লোভ। আমি

এইরকম রীতির বিরুদ্ধেই আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সংগ্রাম করছি।

"তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার যুদ্ধ যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, যন্ত্রের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে—যেরকম অপব্যবহার আজকাল প্রচুর দেখা যাচ্ছে ?"

আমি দ্বিধাহীনভাবে বলব, "হ্যাঁ" তবে তার সঙ্গে আমি যোগ করব, বৈজ্ঞানিক সত্য এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো প্রথমেই লোভের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বন্ধ করতে হবে। তাহলে শ্রমিকদের অতি পরিশ্রম করতে হবেনা, আর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অসুবিধা না হয়ে সুবিধেই হবে। আমি সমস্ত যন্ত্রপাতিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে চাইনা, নিয়ন্ত্রণ করতে চাই।

ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহলে দেখা যায় কথাটার আসল অর্থ হল, যে সমস্ত যন্ত্রপাতি জটিল এবং যেগুলো চালাতে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয় সেগুলোকে তাড়াতে হবে।

হয়ত এগুলোকে চলে যেতে হবে, তবে একটা ব্যাপার আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই। সবচেয়ে বড় করে দেখতে হবে মানুষকে। যন্ত্র যেন মানুষের হাত-পাগুলোকে বিকল করে না দেয়। তবে খুব সুন্দর ব্যতিক্রমও আছে যেমন ধরুন, সিঙ্গার কম্পানির সেলাইএর কল। এর মত প্রয়োজনীয় যন্ত্র কমই উদ্ভাবিত হয়েছে—এই যন্ত্রের সঙ্গে একটা অপূর্ব কাহিনীও যুক্ত আছে। সিঙ্গার দেখেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে নিজের হাতে অতি কষ্টে কাপড় সেলাই করছেন—এবং কেবল তাঁর স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার বশবর্তী হয়ে তিনি যাতে তাঁকে অপ্রয়োজনীয় শ্রম না করতে হয়, সেলাই কলটির পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি যে কেবল তাঁর স্ত্রীর পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন তা নয়,

প্রত্যেকেরই পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন যাঁরা একটি সেলাই কল কিনতে পারতেন।

কিন্তু তাহলে তো সিঙ্গারের সেলাইকল তৈরি করবার জন্য কারখানা খুলবার প্রয়োজন, আর সেই কারখানা চালাবার জন্য প্রয়োজন শক্তিচালিত সাধারণ ধরনের যন্ত্রপাতি।

হ্যাঁ, কিন্তু আমি এরকম কারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণ বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে চাই—সেটুকু সমাজতন্ত্র আমার ধাতে আছে। সেখানে এমন একটি আদর্শ অনুসারে কাজ হবে যেখানে মানুষের উপকারই হবে প্রধান লক্ষ্য, লাভ করা নয়। লোভের জায়গায় থাকবে ভালবাসা।

শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্ত্তন আমি চাই। টাকার জন্য উন্মাদের মত ছুটে চলা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিক শ্রেণীকে কেবল বেঁচে থাকবার মজুরীর নিশ্চয়তা দিলেই চলবেনা—তাদের দৈনন্দিন এমন কাজ করতে দিতে হবে যা শুধু নীরস খাটুনি মাত্র হবে না। শ্রমিকেরা কাজ করবে (আগেই তা বলেছি) চিত্তাকর্ষক এবং সবচেয়ে আরামে। এসবের ব্যাপারে যন্ত্রপাতি কেবল যে শ্রমিককেই সাহায্য করবে তাই নয়, রাষ্ট্রকেও সাহায্য করবে—কিংবা যে লোকটি যন্ত্রটির মালিক, তাকে সাহায্য করবে। কতকগুলি ব্যতিক্রমের মধ্যে আমার এইটিও ধারণায় ছিল। সেলায়ের কল তৈরির পেছনে ছিল ভালবাসা। একজন মানুষের কথাই বিবেচনা করতে হবে সবচেয়ে বেশি। একজন লোকের যাতে কম পরিশ্রম করতে হয় সেটাই দেখতে হবে, সেটাই হবে সৎ, মানবিক বিবেচনা—উদ্দেশ্যের মধ্যে লোভ থাকবেনা। লোভের বদলে ভালবাসা আনলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

পুঁজি কতকগুলি শ্রমিককে শোষণ করে নিজেকে বহুগুণ বাড়ায়, কিন্তু কোটি কোটি মানুষের সম্মিলিত শ্রমকে যদি ভালভাবে

বুঝে শুনে নিয়োগ করা যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে কোটি কোটি মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে।

কিন্তু ভাল হক, খারাপ হক, ভারতবর্ষ কেন পশ্চিমী কায়দায় শিল্পকে গড়বে? পশ্চিমী সভ্যতা হল শহুরে। ইটালি বা ইংল্যাণ্ডের মত ছোট দেশ তাদের ধরন ধারণাকে শহুরে করে তুলতে পারে। আমেরিকার মত বিশাল দেশ—যেখানে লোক সংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম, সম্ভবত অন্যরকম করে তাদের দেশ গড়তে পারে না। কিন্তু এটা ঠিকই যে ভারতবর্ষের মত বড় দেশ, গিজগিজ করছে যেখানে লোকজন, যেখানে প্রাচীন গ্রামীন ঐতিহ্য আজও চলছে, আজ পর্যন্ত সেজন্য কোন অসুবিধে হয়নি, সেখানে সেই ধারাকে বদলে পশ্চিমী ধারণাকে আনার প্রয়োজনও নেই, উচিতও নয়। কোন একটা বিশেষ ব্যবস্থা যখন একটি দেশে, একটি বিশেষ অবস্থায় সুফল দেয়, সেই ব্যবস্থা অন্য দেশে অন্য অবস্থায় সুফল নাও দিতে পারে। একজনের কাছে যা খাদ্য, অন্যের কাছে তাই বিষ হতে পারে। একটি দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি সেই দেশের সংস্কৃতিকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবান্বিত করে। মেরু প্রদেশে থাকে এমন কারুর লোমওলা চামড়ার কোট না হলে হয়ত চলে না, সে কোট পরলে বিষুবরেখার কাছাকাছির লোকজন দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

যন্ত্র ব্যবহার ভাল যখন কাজ করবার লোক কম, যা করতে হবে তার পরিমাণ বেশি। এটা খারাপ যখন কাজের চাইতে কাজের লোকের সংখ্যা বেশি—যেমন ভারতবর্ষের অবস্থা। আমাদের সমস্যা তো এটা নয় যে কোটি কোটি গ্রামের মানুষের জন্য বিশ্রাম খোঁজা দরকার, সমস্যা হল তাদের নিষ্কর্মা সময় কেমন করে ব্যবহার করানো যায়। এই নিষ্কর্মা সময়ের পরিমাণ বছরে প্রায় ছ মাস।

ভগবানের ইচ্ছে নয় যে ভারতবর্ষ পশ্চিমী কায়দায় যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলুক। একটা ছোট দ্বীপের (ইংল্যাণ্ডের) অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ আজ সমস্ত পৃথিবীকে দাসে পরিণত করেছে। যদি ত্রিশ কোটি লোক ঐভাবে অর্থ নৈতিক শোষণ করতে তাহলে পঙ্গপাল যেমন করে খেয়ে শেষ করে সব তেমনি সমস্ত পৃথিবীতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম আছে—লোকসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগই সেখানে থাকে। জাতীয় পরিকল্পনা যা চালু আছে আমার মত তা থেকে আলাদা। শিল্পের দিক থেকে পরিকল্পনা আমার মত নয়। আমি শিল্পায়নের ছোঁয়াচ থেকে আমাদের গ্রামগুলিকে মুক্ত রাখতে চাই।

পণ্ডিত নেহরু চা'ন কলকারখানা গড়ে উঠুক, কারণ সেভাবে যদি এগুলোকে সমাজতন্ত্রের আওতায় আনা যায় তাহলে পুঁজিবাদের অন্যায় থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। আমার বক্তব্য হল, পুঁজিবাদের ভেতরেই রয়েছে অন্যায়, তাই যতই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা হক না কেন পুঁজিবাদের কুফল থেকে তার মুক্তি ঘটবে না।

আমি বিশ্বাস করি না যে কোনো দেশের পক্ষে শিল্পায়নের আদৌ প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষে তার প্রয়োজন আরো কম। আমি বিশ্বাস করি যে স্বাধীন ভারতের একমাত্র কর্তব্য হবে, আর্তনাদে পীড়িত পৃথিবীতে হাজার হাজার কুটিরকে উন্নত করে, পৃথিবীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে অনাড়ম্বর এবং মহান জীবন যাপন।

জটিল বস্তুতান্ত্রিক প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন জীবন, কুবেরের আরাধনা ইত্যাদির সঙ্গে উচ্চ চিন্তার কোন মিল নেই। জীবনের সমস্ত

সুন্দর জিনিস পাওয়া সম্ভব যদি মহানভাবে জীবন যাপন আয়ত্ত করা যায়।

সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে কতকগুলো প্রধান শিল্পের প্রয়োজন রয়েছে। আমি কেবল বাক্যে, কিংবা বন্দুকের সাহায্যে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করিনা। আমি আমার বিশ্বাস অনুসারে কাজ করতে চাই—তার জন্য সামগ্রিক পরিবর্তনের অপেক্ষা করতে চাই না। তাই, কোন কোন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চাই তার একটা তালিকা না বানিয়ে এটা বলতে চাই যে যে যেখানেই বহুলোক কাজ করছে সে সমস্ত কারখানাই রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত। তারা যে জিনিস উৎপাদন করবে—তা সে দক্ষ শ্রমিকই হক বা অদক্ষই হক, তার মালিক হবে তারাই, রাষ্ট্রের মাধ্যমে। কিন্তু যেহেতু এমন একটা ব্যাপার কেবল অহিংসার দ্বারাই সম্ভব, আমি ধনী লোককে বলপ্রয়োগ করে হটাব না, বরং আমি তাঁদের সহযোগিতা চাইব যাতে তাঁরা রাষ্ট্রীয়করণে সম্মত হন। সমাজে অস্পৃশ্য বলে কোন কিছু নেই—তা সে ধনীই হক আর ফকিরই হক। এই দু দলই হলেন একই রোগের ঐ দু'রকম ঘা—আর যার যাই থাকনা কেন, মানুষ সকলেই।

সমাজতন্ত্র কথাটা সুন্দর, আর যতখানি আমি জানি এই সমাজের সবাই সমান, কেউ কারুর নিচে নয়, কেউ উপরে নয়। একজন মানুষের শরীরের উপর মাথা আছে বলেই সেটা বড় নয়, বা পা মাটিতে ছোঁয় বলেই ছোট নয়। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেমন সমান, সমাজের প্রত্যেকটি লোকও তাই। এরই নাম সমাজতন্ত্র।

এতে রাজপুত্র এবং কৃষক, ধনী এবং দরিদ্র, মালিক এবং শ্রমিক সবাই এক। ধর্মের ব্যাপারে সমাজতন্ত্রে অনৈক্য নেই। এখানে

সবাই সমান। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই অনৈক্যই সর্বত্র। খুব বড় হয়ে চোখে পড়ে ঐক্যের অনবস্থান। আমার ধারণার মধ্যে যে ঐক্য আছে, তাতে নানাবিধ রূপের মধ্যে অসাধারণ ঐক্যের স্থান আছে।

এরকম একটা সমাজ ব্যবস্থায় পৌঁছতে গেলে, আমাদের দার্শনিকদের মত মনোভাব নিয়ে বলা উচিত হবে না যে যতক্ষণ না পর্যন্ত সর্বত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ কিছু করবার নেই। আমাদের জীবনধারাকে কোন রকম পরিবর্তন না করে আমরা কেবলই বক্তৃতা করে যেতে পারি, দল গঠন করতে পারি আর বাজ পাখির মত সুযোগ বুঝে শিকার দেখলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। এর নাম সমাজতন্ত্র নয়। যতই আমরা এটাকে শিকার ধরা বলে মনে করব ততই তা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

সমাজতন্ত্রের শুরু হয় একজনকে দিয়ে। যদি এরকম একজনকে পাওয়া যায় তাহলে তার সঙ্গে শূন্য যোগ করতে পারেন। প্রথম শূন্য যোগ করলে হবে দশ—আর তার পর যত শূন্য যোগ করা যাবে ততই দশগুণ করে সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকবে। যদি অবশ্য প্রথম লোকটি নিজেই শূন্য হয়—বা অন্য কথায়, কেউ যদি সমাজতন্ত্রের শুরুই না করে তাহলে যতই শূন্য বসানো যাক না কেন ফলাফল ঐ শূন্যই থাকবে। শূন্য লিখতে যে সময় আর কাগজ লাগবে তা একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে।

এই সমাজতন্ত্র স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তাই এ পেতে হলে স্ফটিকের মত কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন। বদি উপায় অপবিত্র হয় তাহলে ফলাফলও অপবিত্র হতে বাধ্য। তাই রাজপুত্রের মাথা কেটে নিলেই সে কৃষকের সঙ্গে এক হয়ে যাবেনা, কিংবা মালিকের মাথা কেটে নিলেই সে শ্রমিক হয়ে যাবে না। সত্যে পৌঁছুতে গেলে

অসত্যের ভেতর দিয়ে গেলে চলবে না। কেবলমাত্র সত্যভাবে জীবন যাপন করলেই সত্যে পৌঁছনো সম্ভব। অহিংসা আর সত্য কি যমজ ভাই নয়? এর উত্তর হল নিশ্চয়ই "না"। অহিংসা সত্যের মধ্যে এবং সত্য অহিংসার মধ্যে নিহিত। সেজন্যই বলা হয়েছে যে এই দুটি একটি মুদ্রার দুটি দিক—কারুর সঙ্গে কারুর পার্থক্য করা যায় না। মুদ্রাটিকে যেদিক থেকে পড়ুন না কেন তা হবে পৃথক, মূল্য কিন্তু একই। পরিপূর্ণ খাঁটি না হলে এরকম অবস্থায় পৌঁছনো যায় না। মনের বা শরীরের মধ্যে অপবিত্রতা থাকলে অসত্য এবং হিংসা এসে উপস্থিত হবে।

তাই কেবল সত্যবাদী, অহিংস এবং নিষ্পাপ হৃদয়সম্পন্ন সমাজতন্ত্রীরাই ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে।

আসলে সমভাবে বণ্টন ব্যাপারটা হল প্রতিটি মানুষ তার যা প্রয়োজন তা পাবে, তার বেশি কিছু নয়। ধরা যাক একজন লোকের বদহজম হয়েছে, আর তার সিকি পাউণ্ড ময়দা প্রয়োজন তার রুটির জন্য, আর অন্য একজনের প্রয়োজন এক পাউণ্ড ময়দা—এই দু' জনের অভাব পরিপূরণ হওয়া প্রয়োজন। এরকম সুন্দর একটা ব্যাপার করতে হলে সমস্ত সামাজিক অবস্থাকে বদলে ফেলতে হবে। অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ, সে সমাজ অন্যরকম কিছু করতেই পারবে না। আমরা লক্ষ্যে হয়ত পৌঁছতে পারব না, তবে এর কাছাকাছি পৌঁছনোর জন্য আমাদের সর্বদাই নিরলস ভাবে চেষ্টা করা উচিত। আমরা যতখানি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব ততখানিই তৃপ্ত এবং খুসী হব, আর আমরা ততখানিই অহিংস সমাজের দিকেও এগিয়ে যাব। এবার দেখা যাক কেমন করে অহিংসার ফলে সমভাবে বণ্টন করা সম্ভব। এর দিকে যাবার প্রথম পদক্ষেপ তিনি করবেন যিনি তাঁর আদর্শকে জীবনের সঙ্গে

একসূত্রে গেঁথেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে সেইভাবে নতুন করে গঠন করেছেন। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথা মনে রেখে তিনি তাঁর অভাবকে যথাসাধ্য কমিয়ে আনবেন। তিনি সৎভাবে উপার্জন করবেন। ফাটকাবাজী তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করবেন। এই নতুন জীবনের উপযোগী হবে তাঁর বাসস্থান। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। যখন নিজের জীবনে তিনি তাঁর পক্ষে যতখানি করা সম্ভব করেছেন, কেবল তখনি তিনি এই আদর্শ প্রচার করতে পারবেন তাঁর পরিচিতদের এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে।

সত্যিকথা বলতে কি, এই সমভাবে বণ্টন মতবাদের মূল হল, যে সমস্ত ধন উদ্বৃত্ত থাকবে সেগুলোর দায়িত্ব নেবেন ধনী ব্যক্তি, কেননা এই মতবাদ অনুসারে তাঁদের প্রতিবেশীদের চাইতে এক টাকাও বেশি তাঁদের হাতে থাকবার কথা নয়। এটা কেমন করে করা সম্ভব? বিনা বলপ্রয়োগে? নাকি জোর করে ধনীদের ধন থেকে বঞ্চিত করে? এটা করতে হলে স্বভাবতই আমাদের বল প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। এরকম বলপ্রয়োগ সমাজের পক্ষে ভাল হবে না। ফলে সমাজ হবে দরিদ্রতর—কেননা এরফলে যিনি জানেন কেমন করে ধন সঞ্চয় করতে হয় তাঁর সাহায্য থেকে সমাজ বঞ্চিত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অহিংস উপায়ই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। ধনী ব্যক্তিদের কাছে তাঁদের ধন থাকবে—তা থেকে যেটুকু ব্যক্তিগত প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তাঁরা নেবেন, আর যা বাকি থাকবে তাঁরা হবেন তার তত্ত্বাবধায়ক—সমাজের জন্য যা ব্যয়িত হবে। এই বিতর্কে ধরে নেওয়া হয়েছে যে তত্ত্বাবধায়ক সৎপ্রকৃতির।

যদি, প্রচুর চেষ্টা করা সত্ত্বেও ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্রদের অভিভাবক ঠিকমত না হন, এবং ফলে দরিদ্রেরা যদি আরো উৎপীড়িত হন, না

খেয়ে মারা যান, তাহলে কি করা উচিত? এই ধাঁধার সমাধান হিসেবে আমার মনে হয়, অহিংসা, অসহযোগ এবং সামাজিক প্রতিরোধই এর একমাত্র উত্তর। দরিদ্রের সহযোগিতা না থাকলে ধনী ধনসঞ্চয় করতে পারে না। যদি এই ধারণা দরিদ্রদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রচারিত হয় তাহলে তারা সবল হবে—তারা জানতে পারবে কেমন করে অহিংস উপায়ে প্রচণ্ড অসাম্য, যার ফলে তাদের প্রায় অনাহারে থাকতে হচ্ছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পশ্চিমী সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদের সঙ্গে আমাদের ধ্যান ধারণার পার্থক্য মৌলিক। পশ্চিমের লোকের একটি ধারণা হল যে মানব প্রকৃতির মূলে রয়েছে স্বার্থপরতা। আমি তা মনে করি না—কেন না মানুষ এবং পশুর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে পার্থক্য তাহল মানুষ তার বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে পারে পশু এবং তার একই রিপু থাকা সত্ত্বেও সে রিপুর ঊর্দ্ধে উঠতে পারে, অতএব সে স্বার্থপরতা এবং হিংসারও ঊর্দ্ধে উঠতে পারে। স্বার্থপরতা এবং হিংসা হল পশুপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, মানুষের অমর আত্মার নয়। এটাই হল হিন্দুধর্মের মূল কথা। বহু বছরের প্রায়শ্চিত্ত, কঠোর জীবন যাপন ইত্যাদির ফলে এই সত্যে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। তাই, আমাদের যেমন সাধু আছেন যাঁরা তাঁদের দেহকে ক্ষয় করেছেন, জীবন দিয়েছেন আত্মার সমস্ত গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করতে, তেমনি তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন পৃথিবীর উচ্চতম জায়গায় যেতে, সবচেয়ে দুর্গম জায়গায় পৌঁছতে—আমরা যেটা করিনি। আমাদের সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ তাই অহিংসা এবং শান্তিময় আবহাওয়ায় শ্রমিক মালিক জমিদার এবং প্রজার সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

আমি নগ্ন ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় কাজ দেবার পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র দিয়ে অপমান করতে চাই না। আমি তাকে

ভিক্ষে দিয়ে পাপ করতে চাই না, তবে যখন আমি বুঝতে পারব আমি তাদের দৈন্যের জন্য দায়ী আমি তাদের রুটির টুকরো কিংবা পরিত্যক্ত বস্ত্র দেব না। আমি তাদের দেব সবচেয়ে ভাল খাদ্য আর পোশাক—আর তাদের কাজে আমি সাহায্য করব!

ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে কাজ করে খেতে পারে—যারা কাজ করে না অথচ খায় তারা চোর। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতেই হবে এই নীতি কথাটা আমার মনে প্রথমে আসে টলষ্টয়ের রুটি-শ্রমিক সম্পর্কে লেখাটি পড়ে। তবে তারও আগে একথাটার উপর আমার ভক্তি জেগেছিল, সেটা রাস্‌কিনএর লেখা, আন্‌টু 'দিস্ লাষ্ট' গ্রন্থটি পড়ার পর। ভগবানের এই নিয়ম যে, খেতে হলে মানুষকে নিজের হাতের সাহায্যে পরিশ্রম করতে হবে একথাটা প্রথম জোর দিয়ে বলেন টি-এম. বন্‌ডারেফ একজন রাশিয়ান লেখক। টলস্টয় এটাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। আমি মনে করি, ঐ একই কথা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে—যেখানে বলা হয়েছে যে, যে ভোগ না দিয়ে খায় সে চুরি করা খাদ্য খায়। এখানে ভোগ মানে হল রুটির জন্য শ্রম।

বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুই। যে লোক শারীরিক পরিশ্রম করে না তার খাদ্যে অধিকার কেমন করে হয়? বাইবেলে আছে, তোমার রুটি যা খাবে তা যেন তোমার কায়িক পরিশ্রম দিয়ে তৈরি রুটি হয়। একজন কোটিপতি যদি সারাদিন বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দেয় আর তাকে খাওয়ার সময় খাইয়ে দিতে হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়িই তার জীবনে বিতৃষ্ণা এসে যাবে—বেশিদিন এভাবে তার চলবে না। ক্ষিদের জন্য পরিশ্রমের তাই প্রয়োজন—আর সেই পরিশ্রমের ফলেই তার খাদ্য জোটে। যদি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেককে কোন না কোন পরিশ্রম করতে হয় তাহলে যে পরিশ্রম কাজে লাগে, যেমন রুটির জন্য

শ্রম, সেরকম পরিশ্রম কেন সবাই করবে না? কৃষককে কেউ কখনো নিশ্বাস প্রশ্বাস বা পেশীর ব্যায়াম করতে বলে না। মানব সমাজের শতকরা নব্বুই ভাগই কৃষির সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করে। যদি বাকী দশজনও ঐ নব্বুই জনের মত পরিশ্রম করে, অন্ততপক্ষে নিজের খাদ্যের জন্য যতখানি প্রয়োজন ততখানি, তাহলে পৃথিবী কতখানি স্বাস্থ্যপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, এবং সুখীই না হয়। যদি এরকম লোক কৃষিতে সাহায্য করতে আসেন তাহলে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচুর কষ্টের হাত থেকে অনেকটা মুক্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেকে যদি রুটি-শ্রম বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নেন, তাহলে শ্রেণী ভেদের কদর্যতাও দূর হয়ে যায়। এই পরিশ্রম সমস্ত বর্ণকেই করতে হবে। পৃথিবীতে সর্বত্র পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকের বিরোধ, আর দরিদ্র ধনীকে হিংসা করে। যদি প্রত্যেকে তার রুটির জন্য কাজ করে তাহলে ছোট বড়র ভেদাভেদ থাকবে না। ধনী সেখানে থাকবে বটে, কিন্তু তারা কেবল তাদের সম্পত্তির রক্ষক হয়ে থাকবে, এবং কেবলমাত্র জনসাধারণের স্বার্থে করবে তার ব্যবহার।

যিনি অহিংসা মেনে চলেন, সত্যকে পূজো করেন আর স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তাঁর পক্ষে রুটিশ্রম একটা আশীর্বাদের মত। এই শ্রমের সঙ্গে একমাত্র কৃষির সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু অন্তত এখন সবাইকার পক্ষে এটা মেনে চলা সম্ভব নয়। তাই একজন কৃষির বদলে সূতো কাটতে পারে, কিংবা বুনতে পারে, কাঠের মিস্ত্রিরির কাজ করতে পারে কিংবা কামারের কাজ করতে পারে। যদিও কৃষিকাজই হল আদর্শ। প্রত্যেকে নিজের নোংরা নিজেই পরিষ্কার করবে। মলত্যাগ করা, ভোজন করার মতই স্বাভাবিক, তাই সবচেয়ে ভাল হয় যদি প্রত্যেকে নিজেদের মল পরিষ্কার করে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে প্রত্যেকটি পরিবারের উচিত তাদের মল পরিষ্কার করা। আমি বহু বছর ধরে ভেবেছি যে সমাজে মল পরিষ্কারের জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী থাকার মধ্যে

কোন একটা দারুণ অন্যায় রয়েছে। আমরা জানিনা ইতিহাসের কোন সময় থেকে কোন মানুষ এভাবে একটা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সম্মত কাজকে নীচ কাজ বলে অভিহিত করেছিল। সে যেই হক না কেন, কোনক্রমেই বলা চলেনা সে এই কাজ করাতে আমাদের শিশুকাল থেকে এটা মনে বদ্ধমূল করে রাখা উচিত যে আমরা প্রত্যেকেই মেথর, আর সবচেয়ে সহজে এটা করার উপায় হল— যাঁরা এটা ঠিক বলে বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের রুটিশ্রমের জন্য মেথরের কাজ সুরু করে দেওয়া। যদি বুদ্ধিমানের মত মেথরের কাজকে গ্রহণ করা যায় তাহলে মানুষের মধ্যেকার সত্যিকারের সাম্য বুঝতে সাহায্য করবে।

অহিংস স্বাধীনতার দরজা খুলবার চাবিকাঠি হল আর্থিক সাম্য। আর্থিক সাম্যের জন্য কাজ করার অর্থ হল পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যেকার চিরবিবাদকে দূর করা। এর মানে, সামান্য কয়েকজন ধনী ব্যক্তি যাঁদের হাতে জাতির বেশির ভাগ ঐশ্বর্য রয়েছে তাঁদের দাবিয়ে এবং না খেয়ে থাকা নগ্ন কোটি কোটি মানুষকে উপরে তুলে দেওয়া। অহিংস ধরনের সরকার গঠন নিশ্চিতই একটা অসম্ভব ব্যাপার যতক্ষণ ধনী এবং প্রচুর ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। নতুন দিল্লীর প্রাসাদ এবং দরিদ্র শ্রমিকদের বিশ্রী ছোট বাসস্থানের মধ্যে যে ব্যবধান তা স্বাধীন ভারতবর্ষে একদিনও টিকতে পারে না। সেখানে দরিদ্ররা সব চাইতে বড়লোকের মতই শক্তিশালী হবে। যদি না নিজের ইচ্ছেয় সমস্ত ধনী তাদের ক্ষমতা এবং ধন সাধারণের উপকারের জন্য দান করেন, তাহলে একদিন না একদিন রক্তাক্ত বিপ্লব হবেই।

আমি আপনাকে একটা কবচ দেব। যখনি সন্দেহ হবে, বা নিজের কাছেই নিজেকে অসহ্য বলে মনে হবে, একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সবচেয়ে দরিদ্র এবং দরিদ্র যে লোককে আপনি দেখেছেন কখনো তার মুখটাকে মনে আনুন, নিজেকে জিজ্ঞাসা

করুন, আপনি যা করতে যাচ্ছেন তাতে তার উপকার হবে কি? এতে তার কিছু লাভ হবে? এর ফলে কি তার নিজের জীবন এবং ভাগ্যের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসবে? অন্যভাবে বলতে গেলে, এর ফলে কি কোটি কোটি অন্নহীন এবং ক্ষুধার্ত আত্মা স্বরাজ পাবে? তখনি দেখবেন আপনাব সমস্ত সন্দেহের অবসান হয়েছে, আর আপনি নিজেও নমনীয় হয়ে পড়ছেন।

৬। জাতির মঙ্গলের জন্য

(ক) ভারতবর্ষ—আমাদের পবিত্র বাসভূমি

আমার কাছে ভারতবর্ষ সবচেয়ে প্রিয় দেশ, সে আমার দেশ বলেই যে তা নয়, আমি এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি মঙ্গল আবিষ্কার করেছি।

ভারতবর্ষের প্রতিটি জিনিসই আমাকে আকর্ষণ করে। একজন উচ্চাকাঙ্খী মানুষের পক্ষে যত বড় হবার বাসনাই থাকনা কেন, ভারতবর্ষে তার কোন কিছুরই অভাব হবে না।

ভারতবর্ষ আসলে হল একটা কর্মভূমি (যে দেশ কর্তব্য করে), ভোগভূমি (যেখানে লোকেরা ভোগ করে) নয়।

আমরা যদি হত্যা না করে নিজেরা বিলীন হবার শিক্ষা গ্রহণ করি, তাহলে উপকথা এবং ইতিহাসে যে দেশের নাম সমাদৃত কর্মভূমি ভারতবর্ষ হিসেবে, সত্যি সত্যি সে দেশ স্বর্গভূমিতে পরিণত হবে—পৃথিবীতে স্থাপিত হবে ধর্মরাজ্য।

যদি ভারতবর্ষ হিংসা ধর্ম গ্রহণ করে আর যদি আমি তখন বেঁচে থাকি, তাহলে আমি সে ভারতবর্ষে থাকতে চাই না। সে ভারতবর্ষ আমাকে গর্বিত করে তুলবেনা। ধর্ম আমার স্বদেশ প্রেমেরও উর্ধে। একটা শিশু যেমন তার মায়ের স্তন আঁকড়ে ধরে থাকে, আমিও তেমনি ভারতবর্ষকে ধরে থাকি, কারণ আমি অনুভব করি ভারতবর্ষ আমার আত্মাকে পুষ্ট করেছে। আমার সর্বোচ্চ আকাঙ্খাকে তৃপ্ত করবার মত পরিবেশ ভারতবর্ষের আছে। যখন আমার এই বিশ্বাস

গত হবে আমার নিজেকে একটা সহায়হীন শিশু বলে মনে হবে—কোন অভিভাবক আর কখনো খুঁজে পাব না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যা দিনের পর দিন আরো দৃঢ় হচ্ছে, যে যদি আমরা পবিত্র পথে না চলি, যার অন্য নাম হল সত্য এবং অহিংসা, তাহলে এই অসুখী দেশকে আমরা সুখী করতে পারব না।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে যদি ভারতবর্ষ সত্য এবং অহিংসার মাধ্যমে তার ভবিতব্যের দিকে এগোয় তাহলে পৃথিবীর সমস্ত দেশ যে শান্তির জন্য তৃষ্ণার্ত, সেই শান্তি অর্জনে সে কম সাহায্য করবে না। তাহলে অন্য যেসব দেশ ভারতবর্ষকে সাহায্য করছে, ভারতবর্ষও তার পরিবর্তে সামান্য কিছু শোধ করতে পারবে।

আমি আমার অন্তরের গভীরে বিশ্বাস করি যে এই পৃথিবীতে রক্তপাত আর লোকে চায়না। পৃথিবী এর থেকে একটা মুক্তির উপায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে—আর আমি এই বলে আত্ম প্রশংসা করছি যে সম্ভবত এই প্রাচীন দেশ ভারতবর্ষই পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষুধার্ত দেশগুলিকে মুক্তির উপায় দেখাতে পারবে।

আমি বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষ যে সভ্যতায় উপনীত হয়েছে তাকে এ পৃথিবীতে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে বীজ বপন করেছিলেন সে রকম বীজের তুলনা হয়না।

ভারতবর্ষের ভবিতব্য পশ্চিমের রক্তাক্ত পথ ধরে চলবেনা। পশ্চিমও আজ এ পথে ক্লান্ত। ভারতবর্ষ চলবে শান্তির অ-রক্তাক্ত সহজ পথে, দেবতার মত হবে তার জীবন। ভারতবর্ষের আত্মা বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আত্মা হারালে আর

ভারতবর্ষ বেঁচে থাকতে পারবেনা। 'পশ্চিমের আক্রমণ থেকে মুক্তি নেই।' ভারতবর্ষকে তার নিজের জন্য এবং সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সবল হয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে, পশ্চিম থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। জ্ঞান কোন জাত বা মহাদেশের একচেটিয়া বস্তু নয়।

ইউরোপীয় সভ্যতা নিঃসন্দেহে ইউরোপীয়দের উপযোগী, কিন্তু যদি আমরা তাদের নকল করতে যাই তাহলে আমাদের পক্ষে তা হবে সর্বনাশ। এর মানে এই নয় যে আমরা এর থেকে যা কিছু মঙ্গলজনক এবং যা আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব তা গ্রহণ করবনা, বা এটাও সত্যি নয় যে ইউরোপীয়গণ তাদের সভ্যতার ভেতরে যে সমস্ত অমঙ্গলজনক জিনিস ঢুকেছে সেগুলোকে বাদ দেবেনা। বস্তুজনিত যে আরাম তারই সন্ধানে ক্রমাগত চলা, এবং সেই আরাম বহুগুণে বাড়িয়ে তোলায় যে অমঙ্গল হচ্ছে, আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে তার ফলে ইউরোপীয়রা নিজেরাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলাতে বাধ্য হবে, নইলে তাদের আরামের প্রাবল্যে, আরামের ক্রীতদাসে পরিণত হবে এবং তাতেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। হতে পারে, আমার ধারণা ঠিক নয়, তবে এটা ঠিক যে ভারতবর্ষের পক্ষে সোনার হরিণের পেছনে ধাওয়া করার অর্থ হল নিশ্চিত মৃত্যু। আসুন, আমাদের হৃদয়ে পশ্চিমের দার্শনিকের বাণীকে চিরস্থায়ী আসন দিই, সেটা হল—'সহজভাবে থাকা এবং উচ্চ চিন্তা করা।' আজ এটা বাস্তব যে কোটি কোটি লোক বড়লোকী চালে থাকতে পারেনা—আর আমরা যারা লোকেদের হয়ে চিন্তা করি বলে দাবি করি, সেই আমরা যদি বড়লোকী চালে থাকবার চেষ্টা করি, তাহলে উচ্চচিন্তাগুলি আমাদের মন থেকে অন্তর্ধান করবার ঝুঁকি থেকে যাবে।

পশ্চিম থেকে আসা আলোর উপকার থেকে আমায় বঞ্চিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি কেবল দেখতে চাই পশ্চিমের -মোহিনী রূপ দেখে আমার সেটাই আলো বলে যেন মনে না হয়। আমি চাইনা আমার বাড়ির চারদিকে প্রাচীর থাক, আর জানালাগুলো দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাক। আমি চাই সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতির হাওয়া আমার ঘরে ঢুকুক। কিন্তু তাই বলে তার কোনটির দ্বারা আমার পদস্খলন হক তা আমি চাইনা। আমি অন্যের বাড়িতে অবাঞ্ছিত-ভাবে ঢুকতে চাইনা, ভিখিরী কিংবা ক্রীতদাস হয়েও নয়।

আমরা যেন ভুল ব্যাখ্যার জালে বন্দী না হই। ইউরোপীয় লেখকদের অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা সঠিক তথ্যও অবগত নন। ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যেসব ধারণা করেন এবং উদাহরণ দেন তা আমাদের দেশের সঙ্গে পুরোপুরি মেলেনা এবং শেষ পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না, কেননা ইউরোপের অবস্থার সঙ্গে ভারতের অবস্থার মিল খুবই কম। এমনকি রাশিয়ার অবস্থার সঙ্গেও আমাদের অবস্থার মিল নেই।

অতএব, যা ইউরোপের পক্ষে সত্য ভারতের পক্ষে তা সত্য নাও হতে পারে। আমরা আরো জানি, প্রত্যেকটি রাজ্যেরই একটা বিশিষ্ট চরিত্র আছে, পৃথক অস্তিত্ব আছে। ভারতবর্ষেরও নিজস্ব চরিত্র আছে, আর আমরা যদি ভারতবর্ষের নানাবিধ দুরবস্থা সত্যি সত্যি দূর করতে চাই তাহলে ভারতবর্ষের চরিত্রের অদ্ভুত কোন ব্যাপারগুলোকেই বাদ দিলে চলবেনা। তারপর তার দাওয়াই দিতে হবে। আমি বলি ভারতবর্ষকে ইউরোপের মত শিল্পোন্নত করার চেষ্টা করার অর্থ একটা অসম্ভবকে সত্য করার চেষ্টা। ভারতের উপর দিয়ে বহু ঝড় বয়ে গেছে। এটা ঠিক যে প্রতিটি ঝড়ের চিহ্ন তার গায়ে আছে বটে, কিন্তু তবু সে তার স্বাতন্ত্র্য এযাবত কোনক্রমেই হারায়নি। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্য যে বহু সভ্যতার পতন

দেখেছে, কিন্তু নিজে অক্ষত থেকেছে, প্রাচীন রীতিনীতির কিছু কিছু বজায় রেখেছে যদিও কুসংস্কার এবং ভুল তার উপরে চেপে বসেছে। কিন্তু এযাবত ভারতবর্ষ দেখিয়েছে কুসংস্কার এবং ভুল দূর করে ফেলবার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। কোটি কোটি লোকের অর্থনৈতিক সমস্যাকে দূর করবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে, সে উজ্বল বিশ্বাস আজ আমার যতখানি আছে তেমন আর কখনো ছিলনা।

ইউরোপে যে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার চলেছে তাতে বেশ বোঝা যায় যে আধুনিক সভ্যতার মধ্যে অমঙ্গলের শক্তি এবং অন্ধকার নিহিত রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন, অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার মূল কথা হল দেবশক্তি। আধুনিক সভ্যতার অনেকখানিই হল বস্তুতান্ত্রিক—আর আমাদের সভ্যতা হল আধ্যাত্মিক। আধুনিক সভ্যতা বস্তুর নানাবিধ প্রাকৃতিক নিয়ম খুঁজে বার করবার জন্য ব্যস্ত, আর মানুষের বুদ্ধি নিয়োজিত হয় সেই বস্তু দিয়ে কিভাবে উৎপাদন করা সম্ভব বার করতে, এবং ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করতে। আমাদের অনুসন্ধানের অনেকটাই আধ্যাত্মিক।

আমাদের শাস্ত্রগুলি স্পষ্টই বলে দিয়েছে যে সত্যকে ঠিকমত মেনে চলা, সতীত্ব বজায় রাখা, সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রেম, অন্যের সম্পত্তি দখল না করা, দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছু জমিয়ে না রাখা—এ সমস্তই সৎ জীবন যাপনের উপায়। এরকমভাবে জীবন যাপন না করলে ভগবান সম্পর্কে জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সভ্যতা আমাদের নিশ্চিত সাহসের সঙ্গে বলে যে ঠিকভাবে অহিংসা চর্চা করলে—যে অহিংসার সারকথা হল খাঁটি প্রেম এবং করুণা, সমস্ত পৃথিবী আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়বে। এটা যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি প্রচুর উদাহরণ দেওয়াতে কথাগুলো বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে যে অহিংসাকে প্রয়োগ করতে হলে একতরফাই

করা চলে অন্যকে তা মেনে চলতেই হবে তার কোন মানে নেই, তবে সত্যি কথা বলতে কি, অহিংসার শেষ অবস্থায় অন্যেরাও অহিংসা মেনে চলতে বাধ্য হন। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে আমাদের সভ্যতার ভেতরে পৃথিবীকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবার বাণী নিহিত আছে—আমিও সেই বিশ্বাসীদের একজন।

(খ) ভারতবর্ষ এক জাতি

আমি এটা বলতে চাইনা যে, যেহেতু আমরা এক জাতি আমাদের মধ্যে কোনো অমিল নেই। তবে একথা বলা যায়, আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছিলেন—হয় পায়ে হেঁটে নয়তো গরুর গাড়িতে। তাঁরা একে অন্যের ভাষা শিখেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা ছিল। আমাদের এই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ ভারতে (রামেশ্বর) সেতুবন্ধ করেছিলেন, পূর্বভারতে সৃষ্টি করেছিলেন জগন্নাথ, আর উত্তর ভারতে তৈরী করেছিলেন হরিদ্বার—এ সমস্তই করেছিলেন তীর্থযাত্রীদের জন্য, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে জানেন কি? আপনারা এটা স্বীকার করবেন যে তাঁরা নির্বোধ ছিলেন না। তাঁরা জানতেন ভগবানকে বাড়িতেই আরাধনা করা যায়। তাঁরা শিখিয়েছিলেন যে যাঁরা সত্যকে মেনে চলেন তাদের হৃদয়ের মধ্যেই গঙ্গা বয়ে চলেছে। তাঁরা দেখেছিলেন ভারতবর্ষকে প্রকৃতি একটি অবিভক্ত দেশ হিসেবেই তৈরী করেছেন। তাঁরা অতএব বিচার করে বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষ একটি জাতি। এইভাবে চিন্তা করে তাঁরা ভারতের নানাস্থানে পবিত্র জায়গা স্থাপন করেছিলেন। দু'জন ইংরেজের মধ্যে কোন মিল নেই—কিন্তু আমরা সবাই সমান। কেবল আপনি আমি এবং আরো অনেকে যাঁরা নিজেদের সভ্য মনে করেন, অন্যের চাইতে বড় মনে করেন, তাঁরা কল্পনা করেন যে আমরা বহুজাতি।

ভারতবর্ষে বহু ধর্ম থাকার জন্য এর এক জাতিত্ব লোপ পাবে তা হতে পারেনা। বিদেশীর আমদানী হলেই জাতি ধ্বংস হয়ে যায় না। বিদেশীরা এই জাতির সঙ্গে মিশে যায়। একটা দেশ একটা জাতিতে পরিণত হয় যখন এরকম মিশবার ক্ষমতা সে দেশের লোকের থাকে। ভারতবর্ষ সব সময়েই এরকম দেশই ছিল। আসলে যত মানুষ রয়েছে পৃথিবীতে ধর্মও ততগুলিই রয়েছে। যাঁরা জাতির আত্মা সম্পর্কে অবহিত তাঁরা অন্যের ধর্মে বাধা দেন না। যদি হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে ভারতবর্ষে কেবল হিন্দুই থাকবে, তাহলে তাঁরা স্বপ্নলোকে বাস করছেন। হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, খৃষ্টান যাঁরা ভারতবর্ষকে তৈরি করেছেন তাঁরা সবাই আমাদের দেশের লোক, এবং তাঁদের সবাইকে মিলেমিশে অন্তত নিজেদের স্বার্থের খাতিরে বাস করতে হবে। পৃথিবীর কোথাও এক জাতি এবং এক ধর্ম বলতে এক বস্তু বোঝায় না। ভারতবর্ষে কখনো তা ছিল না।

হিন্দু এবং মুসলমান দুই-ই ভারত সন্তান। আমাদের নশ্বর মা, যিনি আমাদের জন্ম দেন তিনি আমাদের শ্রদ্ধা এবং পূজা পাবার অধিকারী। এরকম পূজার ফলে আত্মার মালিন্য দূর হয়। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের অবিনশ্বর মাতা, আমাদের জন্মভূমি, যাঁর বুকে আমরা বাস করি আর যেখানে আমাদের মৃত্যু হয়, তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য এবং ভক্তি আরো কত বেশি হওয়া উচিত? যাঁরাই এদেশে জন্মেছেন এবং এই দেশকে মাতৃভূমি মনে করেন—তা তাঁরা হিন্দু, মুসলমান, পারসি, জৈন বা শিখ হতে পারেন কিন্তু তাঁরা সবাই একই মায়ের সন্তান, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের ভাই, রক্তের চাইতে বড় বন্ধনে তাঁরা যুক্ত।

যাঁরাই এখানে জন্মেছেন, প্রতিপালিত হয়েছেন হিন্দুস্থান তাঁদের সকলেরই জন্য—তাঁদের অন্য কোন দেশ নেই। তাই হিন্দুস্থান

হল পারসিদের, ইহুদীদের, ভারতীয় খৃষ্টানদের, মুসলমান এবং অপরাপর অহিন্দুদের, যেমন এদেশ হিন্দুদের। স্বাধীন ভারতে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবেনা, হবে ভারতীয় রাজত্ব—কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ রাজ্য শাসন করবেনা, করবে সমস্ত জনসাধারণের প্রতিনিধি ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে। এটা আমি কল্পনা করতে পারি যে কতকগুলি সম্প্রদায় মিলে হিন্দুদের সংখ্যালঘু করবে। নির্বাচিতদের সেবা এবং অন্য গুণাবলীর জন্যই নির্বাচিত করা হবে। ধর্ম একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার—রাজনীতিতে ধর্মের কোন রকম স্থানই থাকা উচিত নয়।

(ভাষাভিত্তিক) নতুন করে রাজ্য সীমানা বিন্যাস করার ফলে বিদ্রোহ করে জৈবিক ঐক্যের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মানে এই নয় যে সমস্ত বিশৃঙ্খল করে দিতে হবে, তা উচিতও নয়, কিংবা তার মানে এই নয় যে প্রদেশগুলি যে যা খুশি পথে চলবে—কেউ কারুর বা কেন্দ্রের তোয়াক্কা করবে না, যদি প্রতিটি প্রদেশ ভাবতে থাকে যে সে আলাদা, সার্বভৌম রাজ্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তাহলে কোন অর্থ থাকেনা—আর সেই সঙ্গে প্রতিটি রাজ্যের স্বাধীনতাও বিলুপ্ত হবে।

বাইরের পৃথিবী আমাদের গুজরাতি বলে চেনে না, মারাঠি বা তামিলী হিসেবেও চেনে না, কেবল ভারতীয় বলেই মনে করে।

অতএব, আমরা নিশ্চয় আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এইসব ভেদশক্তির বিরোধিতা করব এবং আমাদের ভারতীয় বলে মনে করব।

সুস্থ প্রাদেশিকতা রয়েছে—তা সব সময়ে থাকবেও। যদি পার্থক্যই না থাকবে তাহলে বিভিন্ন প্রদেশ করার কোন অর্থ হয় না। তবে আমাদের প্রাদেশিকতা যেন ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে না হয়—যেন স্বতন্ত্র না হয়। তা যেন সমগ্র দেশের স্বার্থ রক্ষা

করে। প্রদেশ হল সমগ্র দেশের ছোট ছোট অংশ মাত্র। তুলনা করা যেতে পারে তাদের ছোট ছোট নদীর সঙ্গে যেগুলো একত্রে বিরাট নদী হয়। তাদের শক্তি এবং পবিত্রতা বড় নদীতে প্রতিফলিত হয়। প্রদেশ সম্পর্কেও একথাই খাটে। প্রদেশ যা করবে তা যেন সমস্ত দেশের গৌরব বাড়ায়। রবীন্দ্রনাথের মহান সৃষ্টি বাংলা দেশকে যেমন তেমনি ভারতকেও গৌরবান্বিত করে। তাঁর প্রতিপত্তি কি সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত নয়? দাদাভাই তো কেবল পারসিদের নিয়ে থাকেন নি, কেবল বোম্বাই-এর জন্যও নয়—তিনি বেঁচেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য। কোনো বিশেষ ব্যাপার কোন প্রদেশের একচেটিয়া নয়—প্রদেশে প্রদেশে ঈর্ষারও কোন স্থান নেই—আর যদি তা না হয় তাহলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ মারামারি করে, একে অন্যের ক্ষতি করে বেঁচে থাকতে হবে। যদি তা হয় তাহলে কংগ্রেস বৃথাই এতদিন টিকে রইল। ভারতবর্ষকে ভেঙে টুকরো করবার যে কোন চেষ্টাকে এবং সেই টুকরোগুলোকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার সর্ব্বাঙ্গীন বিরোধিতা করতে হবে। ভারতবর্ষ একদিন শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে তার অসাধারণ দানে জগৎকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে। দেশপ্রেম আমাদের একচেটিয়া নয়। পৃথিবীর অন্যদেশকে বঞ্চিত করে আমরা প্রাচুর্য চাই না। একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমরা বলতে পারব, "আমরা যেমন ভারতের তেমনি পৃথিবীরও প্রজা।" তবে সে সময় কখনই আসবে না যদি আমরা স্বাধীন ভারতের প্রজা হবার কৌশল আয়ত্ব করতে না পারি। আমরা যদি বিষাক্ত প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন হই তাহলে সে কৌশল আমাদের আয়ত্ব হবে না। ঠিকমত জাতীয় জীবন সুরু হয় একজন ব্যক্তি থেকে। আমি সবল হতে চাই, স্বাধীন হতে চাই যাতে কেবল আমি নই, আমার প্রতিবেশিরা পর্যন্ত তাতে উপকৃত হয়। আমরা

ব্যক্তিগতভাবে কিংবা প্রদেশগতভাবে ভাল করব যাতে মাতৃভূমির বেদীতে তার সুফল উৎসর্গ করতে পারি।

জাতিভেদ প্রথা আমাদের ভেতরে এমন শেকড় গেড়ে বসেছে যে মুসলমান, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেদেরও তা স্পর্শ করেছে। এটা ঠিক যে শ্রেণী বিভাগ পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায়ও কিছু কিছু আছে। এর অর্থ এই যে এই ব্যাধিটা সমস্ত মানব-জাতিরই কলঙ্ক। কেবলমাত্র সৎভাবে ধর্মাচরণই হল এ দূর করবার উপায়। আমি কোন ধর্মের বইতেই এই জাতিভেদ প্রথার সমর্থন পাইনি।

ধর্মের চোখে সব মানুষই সমান। শিক্ষা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য থাকলেই একজন অন্যেরা যাদের এসব নেই তাদের চাইতে বড় বলে দাবি করতে পারে না। যদি কোনো লোক সত্যকারের ধর্মে নিবিড়ভাবে অবগাহন করে, সেই ধর্মের পবিত্রকারী বস্তু দিয়ে পবিত্র করে, কঠোরভাবে সে ধর্মীয় নিয়মাবলী মেনে চলে তবে সে, যারা এমন সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত তাদের সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে বাধ্য।

জাতিভেদ এবং প্রদেশভেদ এই দুই দেয়ালকে যে করে হক ভাঙতেই হবে। যদি ভারতবর্ষ এক এবং অবিভাজ্য হয় তাহলে এরমধ্যে যারা নিজেদের বাইরে কারুর সঙ্গে খায় না, বিয়ে করেনা এরকম শত শত ভুয়ো বিভাগের কোন প্রয়োজন নেই। এই নিষ্ঠুর প্রথার মধ্যে ধর্মের কোনো স্থান নেই। এরকম কথা বলে লাভ নেই যে সবাই না করে একজন কেবল যদি এই প্রথা না মানে তাহলে কোন লাভ হয় না—সমাজের সবাই যতক্ষণ না বদলায় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এপর্যন্ত ব্যক্তিগত সাহস দেখিয়ে অমানুষিক সামাজিক বিধিনিষেধ এবং অভ্যাস না ভেঙে কোন সংস্কারই হয়নি। একতা কি? কেমন করে এটা

বাড়িয়ে তোলা যায়? উত্তরটা সহজ। একতার জন্য প্রয়োজন সাধারণ উদ্দেশ্য, সাধারণ লক্ষ্য এবং সাধারণ দুঃখ। সাধারণ লক্ষ্যে পোঁছনর সবচেয়ে ভাল উপায় হল সহযোগিতা—অন্যের দুঃখে সমব্যথী হওয়া এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি সহনশীল হওয়া।

সমস্ত পথিবীর এটা দেখে মনে খুব দাগ কেটেছে যে ভারতবর্ষ রক্তপাত না করেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ঐ স্বাধীনতার উপযুক্ত হবার জন্য আমাদের সঠিকভাবে চলতে হবে।

আমি আমার স্বপ্নে নতুন ভারতবর্ষকে দেখতে পাই। নতুন জীবনের ভিত্ত স্বাভাবিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে। নতুন ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল সমাজ তৈরী করবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করুক।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন—এর বাস্তবতা এখন আমার কাছে পরিষ্কার। এখন যখন অধীনতার বোঝা আমাদের আর নেই, সমস্ত মঙ্গল শক্তিকে এখন একত্রিত করতে হবে, প্রকাণ্ড চেষ্টা করে একটি দেশকে তৈরি করতে হবে—যে দেশ অভ্যস্ত হিংসার পথ পরিত্যাগ করে মানুষের ভিতরকার দ্বন্দ্বগুলির সমাধান করবে। এই দ্বন্দ্ব দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে, কিংবা একই দেশের দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে হতে পারে। আমার এ বিশ্বাস এখনো আছে যে ভারতবর্ষ এর উপযুক্ত হবে আর পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করবে যে দু'টি রাষ্ট্রের জন্মের ফলে খারাপ কিছু হয়নি, বরং বৃহত্তর মানব সমাজের পক্ষে মঙ্গলেরই কারণ হয়েছে।

যদি ভারতের কোনো সংখ্যালঘুকে—যিনি ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু, কেবল সেজন্যই হেয় মনে করা হয় তাহলে আমি বলব এ ভারতবর্ষ আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ নয়। যে ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে আমি আমার সমস্ত জীবন ধরে চেষ্টা করেছি সে ভারতবর্ষে

প্রত্যেকেই, সে তার যে ধর্মই হক না কেন, মর্যাদায় সমান হবে। রাষ্ট্র সর্বাঙ্গীনভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে বাধ্য। আমি আরো বলব, কোন সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রতিষ্টানই সরকারী অনুকুল্য ভোগ করবেনা।

যাঁরা ভগবানকে মেনে চলেন তাঁদের কাছে সব ধর্মই ভাল এবং সমান—কেবল বিভিন্ন ধর্মের লোকেরাই পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করেন, ফলে তাঁদের নিজেদের ধর্মও তাঁদের আর থাকে না। আমি আশা করি যাঁরা ভারত ইউনিয়নে আছেন তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের উপযুক্ত হবেন এবং গর্বিত বোধ করবেন এই ভেবে যে তাঁরা এদেশের সন্তান সন্ততি, তাঁরা আইনের চোখে এক। ধর্ম দিয়ে কোনো জাতের পরীক্ষা করা চলেনা—এটা হল ব্যক্তির সঙ্গে ভগবানের মধ্যেকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। জাত হিসেবে তাঁরা প্রথমে হলেন ভারতীয়—এবং শেষেও ভারতীয়, তাঁদের ধর্ম যাই হক না কেন।

(গ) আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ

আমি সেই ভারতবর্ষের জন্য কাজ করে যাব—যেখানে সবচেয়ে গরীবও মনে করবেন যে এটা তাঁদের দেশ এবং এদেশের ব্যাপারে তাঁদেরও কিছু বক্তব্য রয়েছে, যে দেশে কোনো উচ্চশ্রেণী বা নিম্নশ্রেণী থাকবেনা, যেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেই সম্পূর্ণ মিলেমিশে বাস করবেন। এই ভারতে অস্পৃশ্যতা, মদ্যপান বা কোন নেশার স্থান থাকবেনা। মেয়েদের থাকবে পুরুষদের মতই অধিকার। যেহেতু আমরা পৃথিবীর সকলের সঙ্গেই শান্তি বজায় রাখব—কাউকে আমরা শোষণও করব না, বা কারুর দ্বারা শোষিতও হব না, আমাদের সৈন্যবাহিনী যত ছোট কল্পনা করা যেতে পারে, তত ছোট হবে। কোটি কোটি নীরব মানুষের স্বার্থের যা কিছু অনুকূল সেগুলির প্রত্যেকটি কঠোরভাবে রক্ষা

করা হবে—তা সে বিদেশীই হক বা দেশের জিনিসই হক। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিদেশী এবং দেশীর মধ্যে কোনো পার্থক্য মানিনা। এই আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ, এর চাইতে কমে আমার সন্তুষ্টি হবে না।

আমার কাছে স্বরাজ হল আমাদের সভ্যতার প্রতিভাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। আমি অনেক নতুন কথা লিখতে চাই, তবে যে স্লেটে তা লিখব তা হবে ভারতীয় স্লেট। আমি তখন পশ্চিম থেকে প্রয়োজন মত ধার করতে পেছপা হব না, যখন আমি সে ধার ভাল সুদ সমেত শোধ করতে পারব।

আমার স্বপ্নের স্বরাজ হল দরিদ্র লোকের স্বরাজ। জীবনের যা কিছু প্রয়োজন তা রাজন্যবর্গ এবং ধনীদের সঙ্গে আপনারাও সমানভাবে ভাগ করে নেবেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁদের মত আপনাদেরও প্রাসাদ থাকবে। সুখের জন্য তার প্রয়োজন নেই। আপনি এবং আমি প্রাসাদের মধ্যেও দিশেহারা হয়ে পড়ব। তবে ধনীরা যেসব সুখ সুবিধে ভোগ করেন আপনাদেরও সেরকম সুখ সুবিধে পাওয়া উচিত। আমার কোন সন্দেহ নেই যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা এসব পাবার নিশ্চয়তা পাচ্ছেন ততক্ষণ স্বরাজ পূর্ণস্বরাজ হবে না।

"কখন ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন হয়েছে বলা যাবে?" যখন জনসাধারণ অনুভব করবেন যে তাঁরা তাঁদের নিজেদের অবস্থা তাঁদের নিজেদের চেষ্টায় উন্নতি, আর তাঁদের ভাগ্য তাঁরা নিজেরা যেভাবে ইচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

আমি চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি এবং বহুবার বলেছি যে ভারতবর্ষকে তার কয়েকটি শহরে খুঁজে পাওয়া যাবে না—খুঁজে পাওয়া যাবে এর ৭,০০,০০০ গ্রামে। আর আমরা শহরবাসীরা ভেবেছি যে ভারতবর্ষকে খুঁজে পাওয়া যাবে শহরে আর গ্রাম

তৈরি হয়েছে শহরেরই প্রয়োজনে, শহরের অভাব পূরণ করতে। আর আমরা এটুকুও ভেবে দেখিনি যে ঐ গ্রামবাসীদের খাওয়া পরার যথেষ্ট সংস্থান আছে কিনা, রোদে বৃষ্টিতে বাঁচবার মত যথেষ্ট আশ্রয় আছে কিনা।

শহরের প্রচণ্ড অন্যায়গুলো গ্রামের জীবন ও স্বাধীনতাকে প্রতিনিয়ত ব্যাহত করে।

যদি শহরবাসীরা জানতে চান যে তাঁরা গ্রামবাসীদের জন্যই জীবন ধারণ করছেন, তাহলে তাঁদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি করবেন।

শহর গ্রামবাসীদের শোষণ করছে আর গ্রাম থেকে লোকেরা চলে যাচ্ছে। আমার পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামের লোক যে জিনিস তৈরি করতে পারেন সে জিনিস শহরবাসীদের তৈরি করতে দেওয়া হবে না। শহরের কাজ হল গ্রামে তৈরি জিনিস সংগ্রহ করে বিক্রী করা। গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই হবে। অহিংসার ভিত্তিতে কাজ করতে হলে আমি এ ছাড়া অন্য উপায় দেখি না।

শহর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারে—গ্রামের দিকেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। গ্রামের নানারকম অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, তাঁদের সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি আমাদের দূর করা উচিত। তা করা সম্ভব কেবল তাঁদের মধ্যে থেকে—তাঁদের আনন্দ এবং দুঃখের ভাগী হয়ে, তাঁদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করে, নানারকম সংবাদ তাঁদের দিয়ে।

যে সমস্ত গ্রামবাসী খোলা মাঠে গরমে রোদ্দুরে কাজ করেন, তাঁদের বাঁকা পিঠে রোদ্দুরে যেন আঘাত করতে থাকে, তাঁদের মত বাস করে, গ্রামবাসীরা যে খালে চান করেন, বাসনপত্র

ধোওয়া মাজা করেন, যে জল তাঁদের গোরু মোষের দল পান করে এবং গড়াগড়ি দেয় সেই জল খেয়ে তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে বাস করতে হবে। কেবল তা করলেই আমরা জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি হতে পারব—এবং তাঁরা নিশ্চিতভাবে আমাদের প্রতিটি কথা মেনে চলবেন। নইলে কোনমতেই নয়।

আমরা তাঁদের বোঝাব কেমন করে সময় বাঁচানো যায়, স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় এবং টাকা ঠিকভাবে খরচ করতে হয়। আমাদের গ্রামগুলি সম্বন্ধে লাওনেল কার্টিস বলেছেন এগুলো যেন আবর্জনার স্তূপ। সেই সব গ্রামকে আমাদের আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করতে হবে। যদিও তাঁদের চারদিকেই নির্মল হাওয়া, তাঁরা নির্মল হাওয়া থেকে বঞ্চিত, যদিও গ্রামেই সবচেয়ে টাটকা খাদ্য পাওয়া যায় তবু তাঁরাই বাসি খাদ্য খেয়ে কাল কাটান। আমি খাদ্যের ব্যাপারে অনেকটা ধর্ম প্রচারকের মত কথা বলছি—সেটা ঠিকই, কেননা আমার ধর্ম হল গ্রামগুলিকে সুন্দর করে তোলা।

গ্রামীন শিল্প পরিকল্পনার আসল ব্যাপার হল, এরফলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জিনিসপত্রের জন্য গ্রামের মুখাপেক্ষী হব। আর যখন দেখব যে গ্রামগুলি থেকে কোন কোন প্রয়োজনীয় জিনিস মিলছেনা, তখন দেখব অল্প একটু চেষ্টা করে, একটু সংগঠিত করে এগুলো গ্রামবাসীদের দিয়ে লাভজনকভাবে করিয়ে নেওয়া যায় কিনা। লাভের পরিমাপ যখন করব তখন গ্রামবাসীদের কথাই ভাবব, আমাদের নিজেদের লাভের কথা নয়। প্রথমে হয়ত এরজন্য চলতি দামের চাইতে বেশি দাম পড়বে বা জিনিসগুলো তত ভাল হবে না। পরে অবস্থার উন্নতি হবে যদি আমরা সরবরাহকারীদের সম্পর্কে আগ্রহী হই, আরো ভাল জিনিস তৈরি করার জন্য জিদ করি এবং তাঁদের এব্যাপারে সাহায্য করি।

গ্রামবাসীরা এমন উঁচুমানের পটুতা অর্জন করবেন যাতে তাঁদের জিনিসপত্র খুব তাড়াতাড়ি গ্রামের বাইরে বিক্রী হবে। যখন

আমাদের গ্রামগুলো খুব উন্নত হবে তখন সেসব গ্রামে প্রচুর দক্ষ লোক পাওয়া যাবে, শিল্পী পাওয়া যাবে। গ্রামে থাকবেন গ্রাম্য কবির দল; শিল্পী, স্থপতি, ভাষাবিৎ এবং অনুসন্ধানী দল। এক কথায় বলতে গেলে, গ্রামে তখন দরকারী সবকিছুই পাওয়া যাবে। আজ গ্রামগুলো আবর্জনার স্তূপ। কাল সেগুলো হয়ে উঠবে ছোট ছোট স্বর্গোদ্যানের মত। সেখানে তখন বাস করবেন বুদ্ধিমান লোকেরা—তাঁদের কেউ ঠকাতেও পারবেনা, শোষণও নয়।

ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষকে খাওয়ার জন্য কাজ করতে হয়—ভগবান বলেছেন, যারা না খেটে খায় তারা হল চোর। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার একশোর মধ্যে আশী জনই এরকম চোর—বছরে ছ মাস। এতে কি আর অবাক হবার কিছু আছে যে এ জায়গাটা একটা বিরাট বন্দীশালায় পরিণত হয়েছে? ক্ষুধা ভারতবর্ষকে চরকার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। চরকার আহ্বান সমস্ত ডাকের চাইতে মহান, কারণ এ হল ভালবাসার ডাক। আর ভালবাসাই হল স্বরাজ……চরকার হাওয়া ভারতবর্ষের কোটি কোটি মৃত্যু পথ যাত্রীকে বাঁচিয়ে তুলছে। আমার ত খাদ্যের অভাব নেই, আমি চরকা কাটব কেন? কেউ এমন প্রশ্ন করতে পারেন। কারণ আমার নয় এমন জিনিস খাচ্ছি, তাই। আমি আমার দেশবাসীর পরিশ্রমের ফল ভোগ করছি। দেখুন কেমন করে আপনার পকেটে পয়সাগুলি এল, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার কথার সত্যতা। যদি কোটি কোটি লোক বুঝতে না পারেন তাঁরা কেমন করে তাঁদের বাধ্যতামূলক অবসর সময় কাটাবেন তাহলে সে স্বরাজ অর্থহীন। চরকা ব্যবহার করতে বলার মানেই হল শ্রমের মর্যাদাকে স্বীকার করে নেওয়া।

বহু লোকের ধারণা যে খাদির স্বপক্ষে আমি যে বলছি তার

অর্থ হল হাওয়ার বিরুদ্ধে নৌকা চালানো, যারফলে স্বরাজ তরীর ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী, আর দেশকে আমি অন্ধকার যুগে নিয়ে যাচ্ছি। আমি এই ছোট বিবরণে খাদি সম্পর্কে বিশেষ ওকালতি করতে চাই না, সে কাজ আমি ইতিপূর্বে বেশ ভাল করেই করেছি। এখানে আমি দেখাতে চাই. প্রতিটি কংগ্রেসী বা প্রতিটি ভারতবাসী কেমন করে খাদি আন্দোলনকে জোরদার করতে পারবেন। আসলে এর অর্থ হল এই দেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার এবং প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সমান হবার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। "পায়েস ভাল কি খারাপ তা খেলেই বোঝা যায়।" প্রত্যেককে চেষ্টা করতে দিন তাহলেই প্রত্যেকেই দেখবেন আমি যা বলছি তার মধ্যে সত্য আছে কি নেই। খাদিকে এর সমগ্রতার মধ্যেই পেতে হবে। এর অর্থ হল পূরো স্বদেশী মনোভাব। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা এদেশের মধ্যেই খুঁজে বার করা—আর তাও গ্রামবাসীদের বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের সাহায্যে তা হওয়া চাই। অর্থাৎ যা এতকাল চলছে তার ঠিক উল্টো। বলতে গেলে, ভারতবর্ষ এবং বৃটেনের গোটা কয়েক শহর ৭০০,০০০ গ্রামকে শোষণ এবং ধ্বংস করে বেঁচে আছে। আর যখন এই গ্রামগুলি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তখন এই গ্রামগুলি নিজের থেকেই ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরকে—এমন কি ভারতের বাইরের জগতকেও সেবা করবে, এতে দু দলেরই যথাসম্ভব উপকার হবে।

এরজন্য বহুলোকের মনের এবং রুচির বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। অহিংস উপায়ের কোন কোনটা মেনে চলা সহজ, কিন্তু কতকগুলি মেনে চলা খুবই কঠিন। এর আওতা থেকে কোন ভারতবাসীই বাদ পড়েন না। এরফলে তাঁরা একটি অন্তর্নিহিত শক্তিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, গর্বিত হয়ে ওঠেন ভারতের মানব সমুদ্রের প্রতিটি কণার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে।

এই অহিংসা ফাঁকা কিছু নয়—বহু বছর ধরে অবশ্য এটাই আমরা ভুল ধারণা করে এসেছি, কিন্তু এমন প্রচণ্ড গোপন শক্তি মানুষের আর কিছু নেই—এর উপরই নির্ভর করবে মানুষের অস্তিত্ব। এই শক্তিকেই আমি কংগ্রেসের এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর কাছে নিয়ে এসেছি। আমার কাছে খাদি হল ভারতবাসী মানব সমাজ-এর ঐক্যের, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার, সাম্যের প্রতীক, যা কিনা জহরলালের কবিত্বপূর্ণ বাক্যে, "ভারত-স্বাধীনতার খাদ্যবস্ত্র যোগানদার।" রূপ পেয়েছে।

খাদি মনোভাবের অর্থ কিন্তু উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণ এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুর বণ্টন। তাই, এপর্যন্ত এর যেটুকু সূত্র পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় প্রতিটি গ্রাম তার প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করবে এবং তারপরও শতকরা কিছু বেশি তৈরী করবে শহরের প্রয়োজন মেটানর জন্য।

ভারী শিল্প কারখানাগুলোকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় এবং জাতীয়করণ করতে হবে। তবে গ্রামের বিরাট জাতীয় কাজকর্মের কাছে এই শিল্পের পরিমাণ হবে নগন্য।

আমি আপনাদের আগেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে যদি আপনাদের মধ্যে স্বদেশী মনোভাব থাকে, তাহলে আপনারা বেশির ভাগ অভাব মেটানর জন্য পশ্চিমের দ্বারস্থ হতে অস্বীকার করবেন। এই ভীষণ অভাবের সময় যদি খাদ্য এবং বস্ত্র বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় তাতে আমি বাধা দেব না, অবশ্য ভারতবর্ষের ভেতর থেকে এই দুই অভাব পূরণ করা একেবারেই অসম্ভব হলে তবেই। এটা কোনক্রমেই প্রমাণ করা যায় না। আমি আগে একথা বলতে ইতস্তত করিনি, এবং সেকথা আবার বলছি যে অসংখ্য গ্রামে ভারতবর্ষ তার নিজের প্রয়োজনের মত

খাদি তৈরী করতে পারে, নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্যও উৎপাদন করতে পারে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে জনসাধারন নিজের দিকে তাকান না, আলস্য ঘিরে ধরেছে এঁদের, তাই ভারতবর্ষের ভেতর থেকে এ দুটি অভাব তাঁরা পূরণ করেন না। আমি এমনকি একথাও বলতে চাই যে আমি বরং খাদ্যাভাবে না খেয়ে থাকব। কিংবা বস্ত্রাভাবে নগ্ন হয়ে থাকব তবু পশ্চিমের কাছ থেকে এ দুটি জিনিস আমদানী করব না। প্রচণ্ড সঙ্কল্প না থাকলে ঠিক মত কাজ করা সম্ভব হয় না। আমরা সত্য এবং অহিংসাকে অর্জন করতে পারি কেবল সরল গ্রাম্য জীবন যাত্রার ভেতর দিয়ে। আজ পৃথিবী হয়ত ভুল পথে চলেছে, কিন্তু তাতে আমি ভয় পাই না। হয়ত ভারতবর্ষ সেই প্রবাদের পতঙ্গের মত আগুনের শিখার চারদিকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে একদিন পুড়ে যাবে। তবে এটা আমার অবশ্য কর্তব্য যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব ততক্ষণ আমি ভারতবর্ষকে, এবং ভারতবর্ষের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করব।

গ্রাম্য স্বরাজ সম্পর্কে আমার ধারণা হল, এটা হবে একটা সর্বাঙ্গীণ প্রজাতন্ত্র—এর সমস্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য প্রতিবেশীর কাছে তাকে যেতে হবে না, তবু আরো অনেকগুলো ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন হবে। তাই প্রতিটি গ্রামের প্রধান কাজ হবে নিজেদের জন্য খাদ্য এবং বস্ত্রের জন্য তুলো উৎপাদন করা। এখানে গোরু মোষের জন্য আলাদা জায়গা থাকবে, ছোটদের এবং বড়দের জন্য থাকবে খেলার মাঠ, আর যদি কিছু বেশি জমি থাকে তাহলে সেখানে এমন শস্যের চাষ করা হবে যা বিক্রী করে টাকা পাওয়া যায়—তবে গাঁজা, তামাক, আফিম ইত্যাদির চাষ সেখানে হবে না। গ্রামে একটা গ্রাম্য প্রেক্ষাগৃহ থাকবে,

থাকবে একটা বিদ্যালয় আর সাধারণের জমায়েতের জন্য হল ঘর। গ্রামে পরিষ্কার জল সরবরাহের জন্য নিজস্ব জল কল থাকবে। নিয়ন্ত্রিত কুয়ো এবং পুকুরের সাহায্যে এটা করা সম্ভব হবে। বুনিয়াদি শিক্ষা পুরোপুরি এবং বাধ্যতামূলক হবে। যতখানি সম্ভব সমস্ত কাজকর্ম সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। আজ যেমন আমাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা এবং নানারকম অস্পৃশ্যতা আছে তেমন আর তখন থাকবে না। অহিংসা—যা চলবে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগিতার উপর ভিত্তি করে, তা গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সম্মতি নিয়েই হবে। গ্রামের লোকেরা পাহারা দেবে বাধ্যতামূলকভাবে—এই পাহারাদারদের তালিকা থাকবে এবং সেই তালিকা অনুসারে লোকেরা পরপর পাহারা দিতে থাকবে। গ্রামের সরকার পাঁচজন মিলে পরিচালনা করবেন, নাম হবে পঞ্চায়েত। বছরে বছরে বয়স্ক লোকের ভোটে এঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁদের মধ্যে থাকবেন নারী এবং পুরুষ, এবং তাঁদের ন্যুনতম কিছু যোগ্যতা থাকবে। এঁদের হাতে থাকবে কর্তৃত্বভার এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। সেখানে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কোন শাস্তির ব্যবস্থা থাকবেনা, তাই এই পঞ্চায়েতের উপর ভার থাকবে এক বছরের জন্য আইন তৈরী করবার বিচার করবার এবং কার্য নির্বাহের। আমি এখানে প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে বা কেন্দ্রের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক হবে তার হিসেব করিনি। এখানে আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম্য সরকার কি ভাবে গঠিত হবে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে গণতন্ত্র। ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন তাঁর নিজের সরকার—অহিংসার নিয়মে চলবেন তিনি নিজে এবং তাঁর সরকার। তিনি এবং তাঁর গ্রাম বিশ্ব শক্তিকে অগ্রাহ্য করার মত ক্ষমতা রাখবেন। প্রতিটি গ্রাম-বাসীকে একটি নিয়ম মেনে চলতে হবে আর তা হল, প্রয়োজন হলে আত্মসম্মান এবং গ্রামের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হবে।

এই রকমভাবে তৈরি বহু গ্রাম থাকবে তাতে ক্ষেত্র বড় হতে থাকবে কখনো ছোট হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকবে না। জীবনটা একটা পিরামিডের চূড়ার মত তলার উপর নির্ভর করে থাকবে না। জীবন হবে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত যার কেন্দ্র হবে একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর গ্রামের জন্য মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন—আর গ্রাম মরতে প্রস্তুত থাকবেন আরো অনেক গ্রাম মিলে যে বৃত্ত তারজন্য। এভাবে অবশেষে সমস্ত ব্যক্তি মিলে এক প্রাণ হবে। তাঁরা কখনো একগুঁয়ে হবেন না, সমুদ্রের ঢেউ-এর মহান বৃত্তে তাঁরা একত্রীভূত হবেন। সুতরাং বৃত্তের সবচেয়ে বাইরের পরিধি রেখা ভেতরের বৃত্ত রেখাকে চূর্ণ করবে না, তাকে শক্তি দেবে এবং তা থেকে নিজেও শক্তি সংগ্রহ করবে। কেউ প্রথমও থাকবে না, আবার শেষেও নয়। প্রতিটি লোক, স্ত্রী এবং পুরুষ জানবেন তাঁরা কি চান, আরও বড় কথা হল, প্রত্যেকে জানবেন যে কেউ এমন কিছু জিনিস চাইবেন না যা অন্যেরা সমপরিমাণ শ্রম করে পেতে পারেন না।

ভারতীয় গ্রামবাসীর ক্ষেত্রে, রুক্ষ এবং স্থূল মুখোসের আড়ালে পুরনো সংস্কৃতি ঢাকা পড়ে আছে। এই রুক্ষ বাইরের আবরণের পেছনে আপনি পাবেন গভীর আধ্যাত্মিকতা……এরকম জিনিস পশ্চিমে খুঁজে পাবেন না আপনি। উপরের মুখোসটাকে খুলে দিন, চির অভাবকে এবং অশিক্ষাকে দূর করুন তখন দেখবেন একজন সংস্কৃতি সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট নাগরিককে—যেমনটি ঠিক হওয়া উচিত।

(ঘ) গণতন্ত্র

স্বাধীনতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সর্বাধিক কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং নম্রতা। নিয়মানুবর্তিতা এবং নম্রতা থেকে

যে স্বাধীনতার জন্ম তা কেড়ে নেওয়া যায় না। যথেচ্ছাচার করবার ক্ষমতা হচ্ছে কদর্য চরিত্রের চিহ্ন যা নিজেরও যেমন ক্ষতি করে তেমনি ক্ষতি করে প্রতিবেশীদেরও।

একজন জন্মগণতান্ত্রিক কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলেন। গণতন্ত্র তাঁর কাছে অতি সহজ যিনি স্বাভাবিক জীবনে সমস্ত আইনকে মেনে চলেন, তা সে মানুষের আইনই হক, বা ভগবানেরই হক। আমি নিজেকে একজন গণতান্ত্রিক বলে দাবি করি—সহজাত ধারণায় এবং অনুশীলনে। যাঁরা গণতন্ত্রকে সেবা করতে ইচ্ছুক তাঁরা নিজেদের এই দুটি বিষয় দিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন তাঁরা গণতান্ত্রিক হবার উপযুক্ত কিনা। একজন গণতান্ত্রিক ব্যক্তিকে একেবারে নিঃস্বার্থ হতেই হবে। তিনি কখন নিজের স্বার্থ বা দলের স্বার্থ বজায় রাখবার কথা চিন্তা করবেন না, তিনি চিন্তা করবেন কেবলমাত্র গণতন্ত্র বিষয়ে। তা করলে তবেই তাঁর আইন অমান্য আন্দোলন করবার অধিকার জন্মায়। আমি চাইনা কেউ তাঁর বিশ্বাসকে বিসর্জন দিন, বা নিজেকে দমন করুন। আমি বিশ্বাস করি না যে একটা সৎ এবং জোরালো কোন মত পার্থক্য আমাদের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে, তবে প্রকাশ্যই হক বা ঢেকেই হক, সুবিধাবাদের আপোষ উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে। যদি একমত হতে না পারেন, তাহলে দেখবেন আপনার মতামত আপনার অন্তরের বিশ্বাসকে প্রকাশ করে, সুবিধামত নিজের দলের মত জাহির যেন না করে।

আমি স্বাধীনতার মূল্য আছে বলে মনে করি তবে আপনারা এটা ভুলে যাবেন না যে মানুষ অনেকখানিই সামাজিক। মানুষ যে এত বড় হয়েছে তার কারণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সামাজিক উন্নতির জন্য মানাতে, বদলাতে পেরেছে। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা হল জঙ্গলের পশুর আইন। আমরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক বিধি নিষেধের মাঝামাঝি চলতে শিখেছি। সমগ্র সমাজের মঙ্গলের

জন্য স্বেচ্ছায় সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলার ফলে ব্যক্তি যেমন লাভবান হয়, তেমনি হয় সমাজও—যে সমাজে ব্যক্তি একজন সভ্য।

মানুষের পরিচালিত এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে বিপদ নেই। যে প্রতিষ্ঠান যত বড় সেখানে বিপদের সম্ভাবনাও তত বেশী। গণতন্ত্র একটা বড় জিনিস, ফলে এই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বেশি অপব্যবহারও হবার সম্ভাবনা। এর প্রতিকার অবশ্য গণতন্ত্রকে বর্জন করে নয়, গণতন্ত্রের অপব্যবহারের সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলাই এর প্রতিকার।

গণতন্ত্র হল সমগ্র মানব সমাজের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামগ্রিকভাবে উপকার করার শিল্প এবং বিজ্ঞান।

আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলাম কেন না আমি দেখেছিলাম সামাজিক কাজ কর্ম করতে গিয়েও রাজনীতি ছাড়া চলছিল না। আমি মনে করি সামাজিক এবং ন্যায়নীতির প্রগতির জন্যই রাজনীতির প্রয়োজন। গণতন্ত্রে রাজনীতি জীবনের সব কিছুতেই ছড়িয়ে আছে।

সত্যিকারের গণতন্ত্র বা জনসাধারণের স্বরাজ কখনো অসত্য এবং হিংস্রভাবে আসতে পারে না—কেননা, এটা সহজেই বোঝা যায় যে হিংসার সাহায্যে সমস্ত রকম বিরোধী শক্তিকে এবং শত্রু ভাবাপন্ন দলকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়। তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা আর থাকে না। কেবলমাত্র নির্ভেজাল অহিংসার রাজ্যেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণ প্রকাশ হতে পারে।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমার ধারনা এই যে এর আওতায় সবচেয়ে দুর্বল এবং সবচেয়ে সবলের সুযোগ সুবিধে থাকবে একরকম।

অহিংসা ছাড়া তা হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর সবদেশেই দুর্বলের প্রতি মুরুব্বিয়ানা দেখান হয়।

শক্তি যদি সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া না হয় তাহলে গণতন্ত্র অসম্ভব হয়ে ওঠে, কিন্তু তা বলে গণতন্ত্র যেন জনতাতন্ত্রে পরিণত না হয়। এমন কি একজন নিচু শ্রেণীর শ্রমিক যার সাহায্যে আপনারা রুটি রোজগার করে থাকেন তাঁরও স্বায়ত্ব শাসনে কিছু হাত থাকবে। তবে তাঁদের জীবনের সঙ্গে আপনাদের সংস্পর্শ রাখতে হবে, তাঁদের কুঁড়ে ঘরগুলিকে দেখতে হবে—যেখানে তাঁরা টিনের ভেতরকার সার্ডিন মাছের মত গাদাগাদি করে থাকেন। এই মানব সমাজের অংশকে দেখাশুনা করা আপনার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। আপনি ইচ্ছে করলে তাঁদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারেন, কিংবা ভেঙে দিতে পারেন।

এই সমস্ত জনসাধারণকে, যাঁদের হৃদয় সোনা দিয়ে তৈরি, শিক্ষা দিতে হবে—এঁরা দেশের জন্য অনুভব করেন, শিখতে চান এবং চালিত হতে চান। কিন্তু কয়েকজন বুদ্ধিমান, আন্তরিক কর্মীর প্রয়োজন, তাহলেই সমস্ত দেশকে সংগঠিত করে বুদ্ধিমানের মত চালনা করা যায় এবং জনতারাজ থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়।

যদি আমরা গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত রূপকে বাড়িয়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের অসহিষ্ণু হলে চলবে না। অসহিষ্ণু হলেই বুঝতে হবে উদ্দেশ্যের ওপর তার আস্থা নেই।

যদি আমরা অন্যের বক্তব্য শুনতে না চাই তাহলে গণতন্ত্রের বিবর্তন সম্ভব নয়। যখন আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুনতে চাই না, বা শুনে সেটাকে নিয়ে কৌতুক করি, তখন আমরা বিবেচনার দরজাটাই বন্ধ করে দিই। যদি অসহিষ্ণুতা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আমরা সত্যতে না পৌঁছবার ঝুঁকি

নিই। প্রকৃতি আমাদের যতটুকু বুঝবার ক্ষমতা দিয়েছেন সেটুকু দিয়েই আমরা নির্ভীকভাবে আচরণ করব। তবে আমরা সব সময়ে খোলা মন রাখব আর সর্বদাই এটা মনে রাখব যে আমরা যেটাকে সত্য মনে করেছিলাম সেটা সত্য নাও হতে পারে। এরকম খোলা মন থাকলে সত্যকে আরো জোরদার করে, যদি মনে নোংরা থাকে, তাহলে তা দূর করে। আমি বারবার এটা দেখেছি যে কোন দর্শনেরই সঠিক বিচার করবার একচেটিয়া অধিকার জন্মায় না। আমাদেরই ভুল হওয়া সম্ভব, এবং প্রায়ই আমাদের অভিমতকে বদলানর প্রয়োজন পড়ে। এদেশের মত এত বড় জায়গায় সমস্ত রকম সৎ চিন্তারই স্থান থাকা উচিত। আর অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝবার চেষ্টা করা আমাদের ন্যূনতম কর্তব্য—আর যদি আমরা সেটাকে গ্রহণ করতে না চাই, তাহলে আমরা যতটুকু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা পেতে চাই, তেমনি অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিও আমাদের সেটুকু শ্রদ্ধা থাকা উচিত।

কেন্দ্রে কুড়িজন লোক বসে গণতন্ত্র চালু করতে পারে না। গ্রামের প্রতিটি লোককে নিচের থেকে এটাকে চালু করতে হবে।

কোনো সরকার সম্পূর্ণভাবে অহিংস হতে পারে না। কেন না সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্ব করে এই সরকার। আজকের দিনে এরকম স্বর্ণ যুগের কথা ভাবতেই পারি না। তবে আমি একথা মনে করি, এক শক্তিশালী অহিংস সমাজ গঠিত হবার সম্ভাবনা আছে, এবং আমি সেরকম সমাজ সৃষ্টির জন্য কাজ করছি।

অধিকাংশ লোকেই সরকারী যন্ত্রের জটিলতা ঠিক বুঝতে পারেন না। তাঁরা এটা বুঝতে পারেন না যে প্রতিটি নাগরিক নীরবে হলেও নিশ্চিতভাবে তৎকালীন সরকারকে সমর্থন করে চলেছেন, যদিও তাঁরা জানেন না কিভাবে সেটা করছেন। তাই তাঁর

সরকারের প্রতিটি কাজের জন্য তিনি দায়ী। আর সরকারকে সমর্থন করা নিশ্চয়ই উচিত—যদি না সরকার অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সরকারের কোন কাজ তাঁকে বা তাঁর দেশকে ক্ষতি করে তখন সেই সরকারকে সমর্থন না করা তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি হলে আমি বেজায় ভয় পাই, কারণ, যদিও উপর উপর মনে হবে এরফলে শোষণ অনেক কমে যাবে, কিন্তু এটা মানুষের খুব বড় ক্ষতি করে—কারণ এরফলে মানুষের প্রগতির মূল—ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধ্বংস হয়।

আমি মনে করি প্রতিটি ব্যক্তি—তা তিনি সবচেয়ে দীন হতে পারেন, সুবিচার পাবার অধিকারী। আর সব কিছুই আসে এরপর।

যদি ব্যক্তিকে গণ্য করা না হয় তাহলে সমাজের থাকে কি? একজন লোক কেবল ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকলেই স্বেচ্ছায় সমাজের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন। যদি এটা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় তাহলে তিনি যান্ত্রিক হয়ে পড়েন, সমাজও ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতা বর্জিত কোন সমাজ তৈরি করা প্রায় অসম্ভব।

একটি জাতির স্বরাজের অর্থ হল প্রতিটি ব্যক্তির স্বরাজের সামগ্রিক যোগফল। এরকম স্বরাজ আসে কেবল তখন, যখন প্রত্যেকে নাগরিক হিসেবে তাঁদের কর্তব্য করে চলেন। এতে কেউ তাঁদের অধিকারের কথা চিন্তা করেন না। তবে যখন কর্তব্য আরো ভাল করে করাতে অধিকারের প্রয়োজন হয় তখনই কেবল তাঁরা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন।

যিনি ঠিকমত তাঁর কর্তব্য করে চলেন তাঁর অধিকারও সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি জমতে থাকে। বাস্তবিক, নিজের

কর্তব্য কাজ করবার অধিকারই একমাত্র অধিকার যারজন্য বেঁচে থাকার প্রয়োজন, এবং যার জন্য মৃত্যুও প্রয়োজন হলে বরণ করতে হবে। সমস্ত আইনসঙ্গত অধিকার এরমধ্যেই আছে। আর যে সমস্ত অধিকার রয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে হিংসা নানা ছদ্মবেশে রয়েছে। কর্তব্য হল অধিকারের আসল উৎপত্তি স্থান। যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের কর্তব্য করে চলি তাহলে অধিকারের জন্য আর কোথাও যেতে হবেনা। যদি আমরা আমাদের কর্তব্য কাজ না করে কেবল অধিকারের পেছনে দৌড়ুই, তাহলে তা আলেয়ার আলোর মতই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। যতই আমরা ধাওয়া করব ততই সে আলো দূরে চলে যাবে। কৃষ্ণ সেই কথাই বলেছিলেন এই অমর বাক্যে: "আপনার কর্মেই একমাত্র অধিকার, ফলে নয়।" কর্ম হল কর্তব্য, ফল হল অধিকার।

যখন শক্তি বাইরে থেকে প্রয়োগ করা হয় তখন তারজন্য সর্বদাই পুলিশ আর সৈন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়। অন্তর থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তারজন্য পুলিশ বা সৈন্যের সাহায্য লাগেই না, লাগলেও তা সামান্য।

শক্তি দুরকম। একটি পাওয়া যায় শাস্তির ভয় দেখিয়ে, অন্যটা ভালবাসার মাধ্যমে। ভালোবাসার যে শক্তি, তা ভয় থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা থেকে হাজার গুণে বেশি কার্যকর।

বাবা তাঁর ছেলেমেয়ের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করেন, তিনি এমনকি শাস্তিও দিতে পারেন, তবে হিংসার মাধ্যমে নয়। সেই শক্তি সবচেয়ে বেশি কাজের যা সবচেয়ে কম পীড়া দেয়। শক্তিকে যথার্থ প্রয়োগ করলে সেটা একটা ফুলের মত হাল্কাভাবে অনুভব করা যাবে, কারুরই তাকে একটা অসহ্য বোঝা বলে মনে হবে না।

আমি সবচেয়ে বেশি লোকের জন্য সবচেয়ে ভাল করার নীতিতে বিশ্বাস করিনা। সোজা কথায় বলতে গেলে এর মানে হল শতকরা ৫১ জনের ভালর জন্য, শতকরা ৪৯ জনের স্বার্থ হয়ত অথবা নিশ্চিতরূপেই বিসর্জন দিতে হবে। এই নীতি হৃদয়হীন, এরফলে মানুষের ক্ষতিই হয়েছে। সত্যিকারের মহান মানব নীতি হল সকলের জন্যই সবচেয়ে ভাল কিছু করা চাই, আর এটা করা সম্ভব একমাত্র চরম আত্মদানের সাহায্যে।

এই গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে কাম্য ফল লাভ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কোন একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এক ব্যক্তির প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু এরফলে সমাজ চিরকাল ই ার তসজ্ঘবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে অনবহিত থাকে। এক ব্যক্তির সাফল্য অনেকটা একজন কোটিপতির কোটি কোটি লোককে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের মত। তাই, আমাদের উচিত আমাদের শক্তিকে গঠনমূলক কাজকর্মে নিয়োজিত করা।

কোটি কোটি মানুষ যা একসঙ্গে করতে পারে তাতে একটি অদ্ভুত শক্তির উদ্ভব হয়।

ক্রমাগত দাম বেড়ে যাওয়ার জুজুকে আমি ভয় পাই না। যদি জলে প্রচুর হাঙ্গর থাকে আর আমরা তাদের তাড়ানোর কায়দা না জানি, তাহলে আমাদের খেয়ে ফেলাই তাদের উচিত। তখন আমরা বুঝতে পারব শত্রুর সঙ্গে কেমনভাবে আচরণ করতে হবে। বই পড়ে খাঁটি গণতন্ত্র শেখা যায় না, সরকার—যা কিনা কেবলমাত্র নামেই, আসলে সরকার হল জনগণের ভৃত্য, সেই সরকারও গণতন্ত্র শেখাতে পারেনা। গণতন্ত্র শেখবার সবচেয়ে সুষ্ঠু উপায় হল কঠোর অভিজ্ঞতা।

গণতন্ত্রে ভীতুর স্থান নেই। যখন অধিকাংশ লোক কিছু একটা চান তখন তাঁদের প্রতিনিধির কেবল একটি কাজ করবার থাকে, তাহল সেই চাওয়াটার রূপ দেওয়া এবং ব্যাপারটাকে কার্যকর করে তোলা। জনসাধারণের সবল পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে অনেক যুদ্ধ জয় করা যায়।

আমরা যদি বলি, এখনত স্বরাজ হয়েই গেছে, এবারে চুপচাপ বসে থাকি, তাহলে দেশের সবচাইতে বেশি ক্ষতি করা হবে। এযাবৎ বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধে জনসাধারণের সমস্ত তেজ ব্যয়িত হয়েছিল। সেই তেজকে এখন কাজে লাগিয়ে দেশকে সবল এবং সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হবে, তা না করলে এই তেজ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাবে এবং আমরা বিভক্ত হয়ে পড়ব।

যদি জনসাধারণ স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে চান তাহলে তাঁদের জানতে হবে স্বেচ্ছায় নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার রহস্য। তা নইলে নিয়মানুবর্তিতাকে জোর করেই চাপিয়ে দিতে হবে, তা যিনিই সরকারে থাকুন না কেন। কিন্তু তা তো স্বাধীনতা হবেনা, বরং হবে তার উল্টোটা। জনসাধারণ যেরকম ধাঁচের সরকারও তাঁদের তেমনিই জোটে। যদি লোকেরা গুণ্ডামি করেন, সরকারও তাই করবে, করনিকেরাও তাই করবেন, সবই নিয়ম শৃঙ্খলার নামে। তাতে স্বাধীনতাও হবে না, মুক্তিও হবে না, হবে নৈরাজ্যবাদের ভারসাম্যতা—একদল আর এক দলকে সংযত করবার চেষ্টা করবেন। সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধীনতার প্রধান প্রয়োজন হল স্বেচ্ছায় নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা। যদি লোকেরা ভালভাবে আচরণ করেন, তাহলে সরকারী করনিকেরা তাঁদের সত্যিকারের সেবক হবেন, তা না হলে তাঁরা লোকেদের ঘাড়ে চড়ে বসবেন, তখন মনে হবে ব্যাপারটা ঠিকই হয়েছে।

সমগ্র দেশের পক্ষে এটা খুব লাভজনক হবে যদি নেতারা এবং কর্মীরা তাঁদের কাজের সময়ে ঠিক ঠিক কাজ করেন। যাঁর যতটুকু ক্ষমতা তার চাইতে বেশি কাজ তাঁর কাছ থেকে কেউই প্রত্যাশা করেন না। যদি দিনের শেষে দেখা যায় কিছু কাজ বাকি রয়ে গেল, সে কাজ শেষ করতে হলে হয়ত খাওয়া হল না, কিংবা ঘুম বা আনন্দ করার সময় কমে গেল তাহলে বুঝতে হবে কাজের ধারায় কোথাও গলদ আছে। আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে যদি আমরা সময়ানুবর্তিতা ঠিকমত মেনে চলি—কাজের অনুপাতে সময়টা ভাগ করে নিই, তাহলে দেশের কর্মপটুতার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, আমাদের লক্ষ্যের দিকেও আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারব, আর কর্মীদের স্বাস্থ্য আরো ভাল হবে, তাঁরা আরো দীর্ঘায়ু হবেন।

আমাদের নৈতিক মানগুলো এত তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছে যে আমি এখন বুঝতে পারি যে অতীতে আমাদের সত্যাগ্রহ যুদ্ধ ঠিকমত কেন হয়নি, এবং শেষ পর্যন্ত কেন তা দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে পর্যবসিত হয়েছিল।

তাই আমি বলেছিলাম যে যিনি সর্বদা ভাল হতে চান, আর ভাল করতে চান তাঁর যেন কোন ক্ষমতা না থাকে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে দরিদ্র লোক হল ভারতবাসী—তারাই সরকারী অর্থের মালিক। আমাদের জাগ্রত থাকতে হবে, আরো সাবধান থাকতে হবে, আরো সযত্ন হতে হবে, আর জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের প্রতিটি পাই-এর হিসেব দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। খুব ভালভাবে হিসেব না রাখলে কোন প্রতিষ্ঠানেরই চলেনা—ঠিকমত হিসেব না রাখলে হিসেবের শুচিতা রক্ষা হয় না। আমরা যদি প্রতিটি পাই পয়সার হিসেব না রাখি এবং টাকা পয়সা ভেবেচিন্তে

খরচ না করি তাহলে জনজীবন থেকে আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই উচিত।

সমস্ত জন প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণের কাছে গচ্ছিত থাকবে, আর জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে তা যেন একটি দিনও না চালানো হয়। কোন প্রতিষ্ঠান যদি সঞ্চিত পুঁজির স্বার্থে চালানো হয় তাহলে তা হয় জনমতের পরিপন্থী, আর এটা স্বৈরতন্ত্রী এবং আত্মম্ভর হয়ে ওঠে।

বহু জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আমার যে প্রভূত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে কোন জন প্রতিষ্ঠানেরই স্থায়ী অর্থভাণ্ডার থাকা উচিত নয়। স্থায়ী অর্থ-ভাণ্ডারের মধ্যেই নিহিত থাকে সেই প্রতিষ্ঠানের নৈতিক অধঃপতনের বীজ। জন প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যাপার হল যে সেই প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের সমর্থনে এবং অর্থে পরিচালিত হবে। যখন এরকম কোন প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সমর্থন হারায়। তখন বেঁচে থাকবার অধিকার এর আর থাকে না। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের সাহায্যে চলে দেখা গেছে প্রায়ই সেগুলো জনমতকে অগ্রাহ্য করে, আর জনমতের পরিপন্থী কাজকর্ম করে। আমাদের দেশে এরকম অভিজ্ঞতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই হচ্ছে। কোন কোন তথাকথিত ধর্মীয় অছি হিসেবপত্র দেওয়া বন্ধ করেছেন। অছি হয়ে পড়েছেন মালিক, কারুর কাছে তাঁদের কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়না। আমার সন্দেহ নেই যে জনপ্রতিষ্ঠানের, প্রকৃতির মতই দিনেই হিসেবে বেঁচে থাকা সব চাইতে ভাল। যে প্রতিষ্ঠানের জনসমর্থন নেই তার টিকে থাকবারও অধিকার নেই।

(ঙ) অস্পৃশ্যতা

এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার যে আজকাল ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে খাদ্যাখাদ্যের, আর কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট তার বিচারের। আমি আপনাদের বলতে চাই যে ধর্ম সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি মূর্খতা আর কিছু হতে পারে না। জন্মানো আর কতকগুলো অনুষ্ঠান পালন করলেই কেউ শ্রেষ্ঠ বা কেউ নিকৃষ্ট হয়ে যায় না। আসলে, চরিত্রই হচ্ছে একমাত্র বিচার্য বিষয়। ভগবান মানুষকে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট এরকম ছাপ মেরে পৃথিবীতে পাঠাননি, যদি কোনো ধর্ম পুস্তকে এমন কথা লেখা থাকে তাহলে তার প্রতি আমাদের বশ্যতা থাকা উচিত নয়, কেননা তা হল ভগবানের পরিপন্থী এবং সত্যেরও, কারণ সত্যই ভগবান।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে কিছুতেই মোছে না এমন একটা কলঙ্ক আছে। আমি এটা বিশ্বাস করিনা যে এটা আবহকাল হতে চলে আসছে। আমার মনে হয় এই ঘৃণ্য, ক্রীতদাসসুলভ মনোভাব 'অস্পৃশ্যতা' আমাদের মধ্যে ঢুকেছে যখন আমরা সবচেয়ে হীন ছিলাম। এই অমঙ্গল আমাদের মধ্যে তখন ঢুকেছিল এবং এখনো রয়ে গেছে।

আজকাল হিন্দুধর্মের ভেতর যে অস্পৃশ্যতা চালু রয়েছে, তা আমার মতে ভগবানের এবং মানুষের বিরুদ্ধে পাপ, এবং তাই এর প্রভাব একটা বিষের মত হিন্দু ধর্মের সমস্ত ভাল জিনিসকে আস্তে আস্তে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমার মতে কোন হিন্দু শাস্ত্রই এই ব্যবস্থা সমর্থন করে না। এটা স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য দুদলকেই অপমানিত করেছে। এর ফলে প্রায় চার কোটি মানুষের উন্মেষের পথ বন্ধ হয়েছে। তারা এমনকি সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকেও বঞ্চিত। তাই, এ ব্যাপার যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে. হিন্দুধর্মের পক্ষে, ভারতবর্ষের পক্ষে, এমনকি সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে তা তত মঙ্গলজনক হবে।

অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে আমি যতখানি বুঝতে পারছি তাতে দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটার উপর হিন্দুধর্মের জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে। একথা আমি অনেকবার বলেছি যে, যদি অস্পৃশ্যতা বেঁচে থাকে তাহলে হিন্দুধর্মের মৃত্যু হবে, কেবল তাই নয়, তার সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষেরও মৃত্যু ঘটবে। আর যদি হিন্দুদের হৃদয় থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করা যায় শেকড় ডালপালা সমস্ত, তাহলে পৃথিবীকে শোনাবার মত বাণী এর নিশ্চয়ই থাকবে। আমি প্রথম অংশটা শত শত শ্রোতাকে বলেছি, কিন্তু শেষ অংশটা বলিনি। সত্যকে যিনি ভগবান বলে মানেন এটা তাঁরই কথা। অতএব এর মধ্যে বাড়িয়ে কিছু বলা হয়নি। যদি অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ হয় তাহলে বলা চলে হিন্দুধর্মের আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। কিন্তু অস্পৃশ্যতা হল অতি জঘন্য মিথ্যা। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আমার আন্দোলনের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে হিন্দুরা প্রত্যেকে 'অস্পৃশ্য'কে ছোঁবেন, আমার উদ্দেশ্য এই যে প্রতিটি স্পৃশ্য হিন্দু তাঁর হৃদয় থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করবেন এবং শেষ পর্যন্ত হৃদয় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

স্বার্থপরতার তাগিদে আমাদের উচ্চ, অন্যদের নীচ মনে করাটাই একটা খারাপ ব্যাপার, তার উপর যদি আমরা ধর্মের মধ্যে অস্পৃশ্যতার মত একটা পাপ ঢোকাই তাহলে সেটা কেবলমাত্র যে খুবই খারাপ হয় তা নয়, তাতে অন্যায়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই, যখন শিক্ষিত পণ্ডিতেরা এসে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলতে থাকেন যে অস্পৃশ্যতার মত পাপকে মানা উচিত তখন আমি বেদনা বোধ করি। আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি, যে আমরা হিন্দুরা এখন একটা পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি। আমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক অস্পৃশ্যতা দূর হয়ে যাবেই। কিন্তু যদি এই

পরীক্ষার সময় আমরা আমাদের এই কাজের জন্য অনুশোচনা করি, যদি আমরা নিজেদের শোধরাই, নিজেদের নির্মল করি তাহলে ইতিহাসে এটা লেখা থাকবে যে এটা হিন্দুদের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। কিন্তু যদি, সময়ের গতির সঙ্গে তাল রেখে, আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করি আর হরিজনেরা তাদের শক্তি ফিরে পায় তাহলে হিন্দুদের বা হিন্দুধর্মের কোন প্রশংসাই কেউ করবে না। আমি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছি, এই পরীক্ষায় আমরা যদি অকৃতকার্য হই তাহলে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু উভয়েরই মৃত্যু ঘটবে।

হরিজন কথাটার মানে হল 'ভগবানের মানুষ'। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই বলা হয়েছে ভগবান হল নির্বান্ধবের বন্ধু, অসহায়ের সহায় এবং দুর্বলের রক্ষক। পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিই, ভারতবর্ষের চার কোটি কিংবা তারও বেশি লোক যাঁদের 'অস্পৃশ্য' বলা হয় তাঁদের চাইতে কে বেশি বন্ধুহীন, সহায়হীন বা দুর্বলতর? তাই, যদি কোনো মানুষকে বলতে হয় তাঁরা ভগবানের লোক, তাহলে নিশ্চয় তাঁরা সহায়হীন, বন্ধুহীন এবং হেয় লোক। তাই 'নবজীবন' এর পাতায় আমি সব সময়ে হরিজন বলতে 'অস্পৃশ্য'দের কথাই বলতে চেয়েছি। এর মানে এই নয় যে নাম বদলে দিলে অবস্থার বদল হয়, তবু যে নামটা শুনলেই গালাগাল বলে মনে হয় সে নামটা অন্তত ব্যবহার করতে হয়না। যখন বর্ণহিন্দুরা নিজেদের ভেতর থেকে এটা বিশ্বাস করবেন যে অস্পৃশ্যতা খারাপ, এবং বর্তমান অস্পৃশ্যতাকে দূর করবেন তখন আমাদের সবাইকেই হরিজন বলে ডাকা হবে, কারণ, আমি এটা দীনভাবে নিবেদন করতে চাই যে তখন ভগবান বর্ণহিন্দুদের প্রতি কৃপা করবেন এবং ফলে তখন তাঁদের ভগবানের লোক সঙ্গতভাবেই বলা যাবে।

হরিজনদের সেবা হল ধর্মের ব্যাপার। এর মধ্যে ধূর্তদের কোন স্থান নেই। এটা পুরোমাত্রায় সত্যের এবং অহিংসার উপর

প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র ত্যাগ এবং কৃচ্ছ সাধনের দ্বারাই এ সম্ভব। আমার ভয় হয় যে আমাদের আত্মা শুদ্ধ না করলে আমরা হরিজনদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারব না। এটাতে আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না যদি আমাদের সমস্ত কাজকেই তারা সন্দেহের এবং অবিশ্বাসের চোখে দেখে। এযাবত আমরা তাঁদের কাঁধের উপর বসে কাটিয়েছি। যদি তাঁদের প্রতি ন্যায় বিচারের প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁদের কাঁধে বসে থাকা আর চলবে না, অন্য হিন্দুদের সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা তাঁদের সম্পর্কেও সেই ধারণাই আমাদের করতে হবে।

সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত যদি বর্ণহিন্দুদের করতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে শিক্ষা এবং অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন। এটা তাঁদের আন্তরিকতার একটা পরীক্ষা, কিন্তু যদি হরিজনদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া না হয় তাহলে তাঁদের উন্নতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যদি সমস্ত মন্দিরের দরজা তাঁদের জন্য খুলে দেওয়া হয় তাহলে ধর্মের চোখে হরিজনেরা সমান এটা মেনে নেওয়া হবে। আজ তাঁরা যে হিন্দু সমাজের বাইরে, তাঁরা মন্দিরে ঢুকতে পারলে আর সেটা মনে হবে না।

আর যখন হরিজনদের জন্য মন্দিরগুলো খুলে দেওয়া হবে তখন বিদ্যালয়, কুয়ো এবং এরকম অনেক জিনিসের সুবিধে, হরিজনদের জন্য আপনা আপনি হয়ে যাবে।

একটা সময় সীমা ঠিক করে বেশ জোরের সঙ্গে, যে সমস্ত ব্যাপারে হরিজনেরা অপারগ সে সমস্ত ব্যাপারে যা কিছু বাধা, তা দূর করার আন্দোলন সুরু করা অবশ্যই উচিত। হরিজনদের মুক্তি যেন কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভব হয়—আর যেন ব্যাপারটা পিছিয়ে না দেওয়া হয়। এটা এখনিই করা দরকার—যেমন এখনি পাওয়া দরকার স্বাধীনতা। স্বাধীনতার স্বাদও আমাদের মুখে ছাইএর মত লাগবে যদি আমাদের সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার দেওয়া না হয়।

স্বরাজ হলে সাধারণের মন্দিরে যখন অন্য হিন্দুরা ঢুকতে পারবে তখন অস্পৃশ্যদের ঢুকতে না দেওয়ার মত বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে না। তখন বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের অনুশাসন অমান্য করা হবে না, তবে সেগুলির ব্যাখ্যা কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত হবে না। ধর্ম পুস্তকের অনুশাসনের ভিত্তিতে জনসাধারণের কাজকর্ম করা নির্ভর করবে প্রচলিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। নিজের বিবেক অনুযায়ী চলবার অধিকারকে সম্মান করা হবে। তবে তা জনসাধারণের নীতির পরিপন্থী বা অন্যের অধিকারকে ক্ষুন্ন না করলেই তা সম্ভব। যাঁদের বিবেক অসাধারণ, তাঁদের সেজন্য দুর্ভোগ পোয়াতে হবে, এবং এই বিলাস এর জন্য দাম দিতে হবে। আইন মিথ্যা মর্যাদা সম্পন্ন কোন মানুষ বা শ্রেণীকে সহ্য করবে না—তা সে ধর্মের নামে হক বা প্রচলিত অভ্যাসের নামেই হক।

হরিজনদের যে বাস্তব ক্ষুধার পরিতৃপ্তির প্রয়োজন তা হল সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা—যার ফলে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা হবে, নাগরিকদের সঙ্গে সমান হওয়া, মানুষ হিসেবে ঠিকমত ব্যবহার পাওয়া, ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া, পরিষ্কার স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস, মিতব্যয়িতা, পরিশ্রম এবং শিক্ষা। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন ধৈর্য, আত্মদান এবং বুদ্ধিমানের মত ধীরে ধীরে কাজ করে যাওয়া। আপনারা যদি আমাকে হরিজনদের খাওয়ানোর জন্য টাকা দেন তাহলে আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করব, কারণ আমি তাঁদের ভিখিরীও করতে চাই না।

আমি বিশ্বাস করি যদি অস্পৃশ্যতা সত্যিই নির্মূল হয়ে যায় তাহলে হিন্দু ধর্ম থেকে একটা বড় কলঙ্ক যে কেবল দূর হবে তা নয়, এর ফলে পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যাবে। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম হল মানব জাতির মধ্যেকার কলঙ্কের বিরুদ্ধে।

একটা অভিজ্ঞতা আমার স্পষ্ট মনে আছে। অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য আমি যে ২১ দিন উপবাস করেছিলাম ব্যাপারটা সেই

কে এরকম এত বেশি করতে পারেন—নারী, মানুষের জন্মদান-কারিনী মা ছাড়া? যখন ন মাস ধরে নারী শিশুকে বহন করেন, পুষ্ট করেন এবং সেই কষ্টকে আনন্দের সঙ্গে মেনে নেন তখন এটা বোঝা যায়। প্রসবের বেদনার চেয়ে বেশি আর কি বেদনা থাকতে পারে? কিন্তু নারী সৃষ্টির আনন্দে সে বেদনা ভুলে যান। আর কে প্রতিদিন কষ্ট করেন যাতে শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়? নারীকে তাঁর এই ভালবাসা সমগ্র মানব সমাজে ছড়িয়ে দিতে দিন, তাঁকে ভুলে যেতে দিন যে নারী কখনো পুরুষের লোভের বস্তু ছিলেন বা লোভের বস্তু হতে পারেন। তাহলেই তিনি গর্বের সঙ্গে পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়াবেন পুরুষদের মা, সৃষ্টিকারিনী এবং নীরব নেত্রী হিসেবে।

আত্মবলিদানের সাহসের ক্ষেত্রে নারী পুরুষদের চেয়ে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ, কারণ আমি বিশ্বাস করি নারীর তুলনায় পুরুষের শক্তি পশুর মত।

নারীদের পুরুষদের তুলনায় দুর্বল বলা মিথ্যা অপবাদের সমান। এটা নারীদের প্রতি পুরুষদের অবিচার। যদি শক্তির অর্থ হয় পশুশক্তি, তাহলে এটা ঠিকই যে নারী পুরুষের চাইতে কম পশুত্ব সম্পন্ন। যদি শক্তির অর্থ অর্থ নৈতিক-শক্তি হয় তাহলে পুরুষের চাইতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি। সবচেয়ে বেশি সহজাত বুদ্ধি কি নারীদের নেই, তাদের আত্মত্যাগ, সহ্য শক্তি, সাহস কি বেশি নয়? নারী ছাড়া পুরুষ সম্ভব নয়। যদি অহিংসা আমাদের ন্যায়নীতি হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ নারীদের কাছে।

আমি যদি নারী হয়ে জন্ম নিতাম, তাহলে, পুরুষদের দাবি যে মেয়েরা তাদের খেলার পুতুল হবার জন্য জন্মেছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতাম। আমি মনে মনে নিজেকে নারীরূপে ভেবেছি যাতে আমি নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারি।

বিষয়ের। তার আগের দিন রাত্রে ঘুমুতে গিয়েছিলাম, আমি জানতামই না তার পরদিন সকালেই আমি উপবাস সুরু করব। রাত প্রায় বারোটার সময় কেন জানিনা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, এবং একটা গলার আওয়াজ পেলাম, সেটা আমার মনের ভেতর থেকেও হতে পারে বাইরে থেকেও হতে পারে, ফিস ফিস করে বলল, 'তুমি উপবাস সুরু কর।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদিনের জন্য?' সে আবার বলল, 'একুশ দিনের জন্য।' 'কবে সুরু করব?' আমি জিজেস করলাম। সে বলল, 'তুমি কাল থেকে সুরু কর।' আমি মনস্থির করে শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি আমার সঙ্গীদের কাউকেই কথাটা সকালের প্রার্থনার আগে বলিনি। আমি তাঁদের হাতে এক টুকরো কাগজে আমার সঙ্কল্পের কথা এবং আমাকে যাতে তাঁরা বাধা না দেন তা লিখে দিলাম, কারণ আমার সঙ্কল্প কোনক্রমেই টলবার ছিল না। কি হল? ডাক্তাররা তো ভাবলেন এই উপবাসের ফলে আমি মারাই পড়ব। কিন্তু আমার মনের মধ্যে কে যেন বলল আমি পারব, আর আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে। ওরকম অভিজ্ঞতা আমার তার আগেও হয়নি, পরেও না।

(চ) নারী

নারী হল পুরুষের সঙ্গী—মনের দিক থেকে নারী পুরুষের সমকক্ষ। মানুষের ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীর সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষের সবচেয়ে বড় স্থান, তেমনি নারীদের ক্ষেত্রে বড় স্থান নারীদের। এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত—লেখাপড়া শেখার ফলে এটা হয় না। অত্যন্ত জঘন্য প্রচলিত অভ্যাসের ফলে অজ্ঞ এবং অসার পুরুষেরা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠাসনে বসে রয়েছে, তারা এটা পাবার উপযুক্ত নয়, তাদের এটা পাওয়া উচিতও নয়।

নারী হল অহিংসার অবতার। অহিংসার অর্থ হল অফুরন্ত প্রেম, যার অর্থ হল কষ্ট সহ্য করবার অসীম ক্ষমতা। আর

আমি আমার স্ত্রীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারিনি যতক্ষণ না আমি আগের চাইতে অন্যভাবে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে শুরু করেছি, আমি সেজন্য আমার সমস্ত তথাকথিত স্বামীজনোচিত অধিকার তাঁকে অর্পণ করেছি।

মানুষ পাপের জন্য যত দায়ী তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি অবমাননাকর, বিহ্বলকর, পশুজনোচিত পাপ হল নারীদের (যে নারা জাতি দুর্বল নয়) অবমাননা। দুজনের মধ্যে নারীই মহান কেননা আজও নারী ত্যাগের, নীরব দুঃখ সহ্যের, নম্রতার, বিশ্বাস এবং জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক।

নারীরা যেন না ভাবেন তাঁরা পুরুষের লোভের বিষয়বস্তু। প্রতিকার তাঁদের হাতে যতটা, পুরুষদের হাতে ততটা নয়।

নারীরা হলেন জীবনের যা কিছু খাঁটি এবং ধর্মময় সে সবের বিশেষ রক্ষক। তাঁরা প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল, ফলে তাঁরা হয়ত কু-সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলতে সময় নেন, কিন্তু তাঁরা সেইসঙ্গে যা কিছু খাঁটি এবং মহান সেগুলোও পরিত্যাগ করতে দেরী করেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে যেসব কথা লেখা আছে তা ভাবলেও খারাপ লাগে। একজন লোক যিনি নারীকে তাঁর নিজের মতই অধিকার দিতে প্রস্তুত, যিনি নারীকে জাতির জন্মদাত্রী বলে মনে করেন, তিনি সেই লেখাগুলোকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না। অবশ্য 'স্মৃতিতে' নারীদের ঠিকমত মূল্যায়ণও করা আছে এবং তাঁদের স্থানও সেই হিসাবে নির্দিষ্ট করা আছে। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্ন হল 'স্মৃতি'তে যে দুরকম কথা উল্টোপাল্টাভাবে লেখা আছে, আর যেগুলো নীতি বিগর্হিত সেগুলো সম্পর্কে কি করা হবে? আমি এর আগে অনেকবার বলেছি যে ধর্মপুস্তকের নামে যেসব বই ছাপা হয়েছে সেগুলোর সবটাই ভগবানের কিংবা দৈবভাবে উদ্বুদ্ধ বাণী নয়। কিন্তু

সবাই বুঝতে পারেন না কোনটা ভাল এবং খাঁটি, কোনটা খারাপ এবং ভেজালে ভরা। তাই এমন কোনো একটা বিশ্বাস-যোগ্য সংস্থা থাকা উচিত যে সংস্থা ধর্মের নামে যেসব বই চালু আছে সেগুলো থেকে নীতি বিগর্হিত এবং ধর্ম বিগর্হিত অংশগুলো ছেঁটে বাদ দিয়ে দেবে আর এরকম ধর্মপুস্তক হিন্দুদের পথ নির্দেশ করবে। এটা নিশ্চিত যে হিন্দুদের সবাই, এবং যাঁরা হিন্দুধর্মের নেতা বলে স্বীকৃত তাঁরা এরকম কোনো সংস্থাকে ঠিক বলে মেনে নেবেন না, কিন্তু তাহলেও এই পবিত্র কাজ বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে চলবে। আন্তরিকভাবে, সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করলে একদিন না একদিন তার ফল ফলবেই। যাঁদের এরকম সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন তাঁদের নিশ্চয় এ প্রভূত সাহায্য করবে।

স্বামীরা যে স্ত্রীদের একেবারে নীচে নামিয়ে রেখেছে, আর স্ত্রীদের অত্যন্ত বেশী মাত্রায় স্বামীদের সঙ্গে মিশে যেতে বলছে সেটাই হিন্দু সংস্কৃতির ত্রুটি। কখনো কখনো স্ত্রীদের প্রতি জোর খাটানোর ফলে স্বামীরা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে।

আমি কিন্তু নারীদের অধিকার নিয়ে কোন আপস করতে রাজি নই। আমার মতে, আইনত যে সমস্ত জিনিস পুরুষ করতে পারে নারীদেরও সে বিষয়ে আইনগত বাধা থাকা উচিত নয়। আমার চোখে পুত্র এবং কন্যা উভয়েই সম্পূর্ণ সমান। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীরা সেই পরিমাণে তাঁদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হবেন, তখন তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের প্রতি প্রচণ্ড অসম ব্যবহারকে আপত্তি জানাবেন।

যদি স্বামী দেবতা হন, তাহলে স্ত্রী হলেন দেবী। স্ত্রী ক্রীতদাসী নন, তিনি হলেন সমাজ অধিকার সম্পন্না বন্ধু এবং সঙ্গিনী। প্রত্যেকেই একে অন্যের গুরু।

পুত্রের যা প্রাপ্য, কন্যারও তাই।

স্বামী যা আয় করেন তা স্বামী এবং স্ত্রীর যুগ্ম সম্পত্তি, কেননা স্বামী আয় করেন স্ত্রীর সাহায্যেই—হতে পারে তিনি কেবল রান্না করেই সাহায্য করেন।

যদি কোনো স্বামী তাঁর স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করেন তাহলে স্ত্রীর অন্যত্র আলাদাভাবে থাকবার অধিকার আছে। দুজনেরই সন্তান-সন্ততির উপর সমান অধিকার। সন্তানেরা বড় হলে এই অধিকার তাঁদের আর থাকে না, কিংবা বড় হবার আগেই যদি স্বামী কিংবা স্ত্রী অনুপযুক্ত হন তাহলেও এই অধিকার তাঁদের থাকে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রকৃতি যেভাবে নর এবং নারীকে পৃথক করেছে—যা চোখে দেখা যায়, এ ছাড়া আমি নরনারীর মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য মানি না।

বিয়েতে আত্ম অবমাননাকারী পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত গড়ে তুলতে হবে, আর যে সমস্ত যুবক এই অশুভ উপায়ে সোনা অর্জন করে তাঁদের হাতকে কলঙ্কিত করেন তাঁদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কন্যাদের পিতামাতার যেন বিলিতি ডিগ্রী দেখে চোখ ঝলসে না যায় আর তাঁরা যেন তাঁদের মেয়েদের বিয়ের জন্য সাহসী বর খুঁজতে নিজেদের গোষ্ঠীর এবং প্রদেশের বাইরে চলে যান।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই পণ প্রথা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এ নিয়মকে দূর করতে হবে। বিয়েটা পিতামাতার টাকা পয়সা সংগ্রহ করবার উপর নির্ভর করবে না। এই রীতিটা জাতিভেদ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ভেতর থেকে কয়েকশো যুবক বা যুবতীদের খুঁজে পেতে হবে এই রীতি চলতেই থাকবে, তা এর বিরুদ্ধে যতকিছুই বলা হক না কেন। মেয়েদের, ছেলেদের, কিংবা তাদের বাবা মায়েদের এই বিশ্রী রীতিকে দূর করতে হলে জাতিভেদ প্রথাকে ভেঙে ফেলতে হবে।

আমরা ধর্মের নামে গোরুদের রক্ষা করবার জন্য চিৎকার করি, কিন্তু অল্প বয়স্কা বিধবা গোরুদের রক্ষা করার দায়িত্ব অস্বীকার করি। ধর্মে শক্তি প্রয়োগে আমাদের আপত্তি। কিন্তু ধর্মের নামে আমরা জোর করে কম বয়সী বিধবা মেয়েদের যারা বিয়ের অনুষ্ঠানটাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা তাদের উপর বৈধব্য চাপিয়ে দিই। কম বয়সী মেয়েদের উপর বৈধব্য পশুর মত জোর করে চাপানো হয়—এর ফলে হিন্দুদের প্রচণ্ড দাম দিতে হচ্ছে। আমাদের বিবেক যদি সত্যি সত্যি জেগে থাকে তাহলে পনের বছরের আগে কারুর বিয়েই হবেনা, বৈধব্য ত নয়ই। আর এরকম বিয়ে হলে আমরা ঘোষণা করব যে এ বিয়ে ধর্মসঙ্গত হয়নি। কোনো শাস্ত্রেই এরকম বিধবাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। যে নারী তাঁর সঙ্গীর ভালবাসার অভাব অনুভব করেন তিনি যদি স্বেচ্ছায় বৈধব্য জীবন যাপন করেন তাহলে তাঁর জীবনে একটা অদ্ভুত মর্যাদা, একটা সৌন্দর্য যুক্ত হয়, গৃহকে পবিত্র করে এবং ধর্মকে পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : আপনি আমাদের সমাজের ভেতর প্রচলিত অনেক খারাপ জিনিসের কথা বলেছেন। সমাজে সেগুলো আছে ঠিকই, কিন্তু যদি পুরুষেরা সমাজকে যতটুকু প্রয়োজন না বদলান তাহলে আমরা নারীরা সে বিষয়ে কি করতে পারি?

উত্তর : কোনো অবস্থাতেই পুরুষদের তুলনায় নারীদের নিজেদের হীন মনে করা উচিত নয়। অনেক ভাষাতেই এটা লেখা আছে যে স্ত্রী হল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী, এবং সেই একই যুক্তিতে পুরুষ নারীর অর্ধেক। তারা দুটো আলাদা প্রাণী নয়, একজন অন্য-জনের অর্ধেক। ইংরেজী ভাষায় আরো একটু বেশি করে বলা আছে—নারীরা হলেন পুরুষের 'শ্রেষ্ঠতর অংশ'। তাই, আমি নারীদের উপদেশ দিই তাঁরা যেন সমস্ত অবাঞ্ছিত এবং অর্থহীন বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে সামাজিক বিদ্রোহ করেন। যে সমস্ত বাধা-নিষেধ ভাল, সেগুলো সর্বতোভাবে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা উচিত। সামাজিক বিদ্রোহে ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এটা ধরেই নেওয়া হয় যে, এই সংগ্রাম খাঁটি এবং যুক্তিপূর্ণ।

ভগিনীগণ, আমি চাই আপনারা হরিজনদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য দান করুন। আপনারা জিজ্ঞেস করেছেন আপনারা কেমন করে হরিজনদের সেবা করবেন। আমি চাই, সবচেয়ে প্রথমে আপনারা নিজেদের হৃদয় থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করুন, হরিজন ছেলেমেয়েদের এমনভাবে সেবা করুন যেরকমভাবে আপনারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সেবা করে থাকেন। আপনারা তাদের নিজেদের আত্মীয় বলে মনে করুন, আপনাদের ভাই বোন বলে মনে করুন। তারা একই ভারতমাতার সন্তান। আমি নারীকে সেবা এবং ত্যাগের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে পূজা করেছি। পুরুষ কখনো আপনাদের মত নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ করতে পারে না—প্রকৃতি আপনাদের সেইভাবেই সৃষ্টি করেছেন।

নারীর হৃদয় দয়ালু—কারুর দুঃখ দুর্দশা দেখলে তা গলে যায়। যদি তাহলে হরিজনদের দুঃখ দুর্দশা আপনাদের বিচলিত করে আর আপনারা অস্পৃশ্যতা বর্জন আর, সেই সঙ্গে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ দূর করেন তাহলে হিন্দুধর্ম থেকে গ্লানি দূর হবে আর সমাজ বিরাট পদক্ষেপে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে এগিয়ে চলবে। শেষ পর্যন্ত এরফলে সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গল হবে—অর্থাৎ ৩৫ কোটি লোকের উন্নতি হবে।

এটা আমার সৌভাগ্য যে আমার কর্মময় জীবনে করুণ এবং আত্মাকে আন্দোলিত করে এমন দৃশ্য দেখবার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু এটা যখন আমি লিখছি তখন হরিজনদের সেবার চাইতে আর কোনো বেশি করুণ ঘটনা আমার মনে পড়ছেনা! বাদাগারা নামে একটা জায়গায় আমি সদ্য একটা বক্তৃতা শেষ করেছি। এই সভায় আমি নারীদের কাছে গহনা ইত্যাদি দান করবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। আমার কথা শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি তখন যে সমস্ত উপহার

পেয়েছি সেগুলোকে বিক্রী করছি, হঠাৎ প্লাটফরমের উপর উঠে এল ১৬ বছরের একটি মেয়ে, নাম তার কৌমুদী। সে তার হাত থেকে এক গাছা চুড়ি খুলে ফেলে বলল আমি তাকে একটা অটোগ্রাফ দেব কিনা। আমি যখন অটোগ্রাফ দেবার ব্যবস্থা করছি, তখন সে অন্য চুড়িটাও খুলে ফেলল। তার দু হাতে একটা করে চুড়িই ছিল। আমি তাকে বললাম, "তোমার দুটো চুড়িই আমাকে দেবার প্রয়োজন নেই—আমি একটা চুড়ির বদলেই অটোগ্রাফ দেব।" উত্তরে সে তার সোনার হার খুলে ফেলল। খোলাটা খুব সহজ কাজ ছিল না। তার লম্বা বিনুনি থেকে হারটিকে খুলতে হচ্ছিল। কিন্তু মালাবারের মেয়েটির এ ব্যাপারে কোনো মিথ্যা লজ্জা ছিল না সে কয়েক হাজার নরনারীর সামনেই সমস্ত কাজটা করল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার বাবা মায়ের অনুমতি নিয়েছ ত? কোন উত্তর পেলাম না। তখনো তার ত্যাগ সম্পূর্ণ হয়নি। তার হাত দু'টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার কানের দিকে গেল এবং দুটো দামী পাথর বসানো দুল লোকেদের প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে খুলে ফেলল, তার আনন্দকে সে আর চেপে রাখতে পারল না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে তার এই ত্যাগের জন্য বাবা মায়ের সম্মতি নিয়েছে কিনা। আমি সেই লাজুক মেয়েটির কাছ থেকে কোনো উত্তর পাবার আগেই কে যেন আমাকে বলল তার বাবা ঐ সভাতেই উপস্থিত আছেন এবং আমি যে সমস্ত জিনিস নীলাম করছিলাম, সেই নীলাম ডেকে তিনি আমাকে সাহায্য করছিলেন, আমি আরো শুনলাম তিনি তাঁর কন্যার মতই, ভাল কাজের জন্য দান করবার ব্যাপারে একই রকম উদার। আমি কৌমুদীকে মনে করিয়ে দিলাম যে, সে যেসব গয়না দিয়ে দিয়েছে তা আর পরতে পারবে না। সে সেই সর্তে খুব দৃঢ়ভাবে রাজি হল। তাকে অটোগ্রাফ দেবার

আগে একথাটা না বলে পারলাম না "তুমি যেসব গয়না আমাকে দিয়েছ সেগুলোর চাইতেও খাঁটি গয়না হল তোমার ত্যাগ।"

(ছ) জাতীয় ভাষা

আমাদের ভাষা আমাদেরই প্রতিফলিত করে, আর যদি আপনারা আমাকে বলেন আমাদের সর্বোত্তম ভাব প্রকাশ আমাদের ভাষায় করতে পারিনা কেননা এ ভাষা দরিদ্র, তাহলে আমি বলব যত তাড়াতাড়ি আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই ততই ভাল। এমন কি কেউ আছেন যিনি ইংরেজী ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা কখনো হতে পারে বলে মনে করেন? একটা দেশের উপর এরকম বাধা চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ কি? পুনায় আমার কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে কিছু নিবিড় আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁরা আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে প্রতিটি ভারতীয় যুবক, যেহেতু তারা ইংরেজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শিখেছে, অন্তত ছ'টি মূল্যবান বছর তাতে নষ্ট করেছে। আমাদের স্কুল এবং কলেজের ছাত্রসংখ্যা দিয়ে এই সংখ্যাকে গুণ করুন, তাহলে আপনারা নিজেরাই দেখতে পারবেন আমাদের দেশের কত হাজার বছর সময় নষ্ট হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমাদের কাজ সুরু করবার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। তা থাকবে কেমন করে যদি আমাদের জীবনের মূল্যবান বছরগুলি একটা বিদেশী ভাষা শিক্ষায় কাটিয়ে দিই? এই চেষ্টাতেও আমরা সাফল্যলাভ করতে পারি না।

ঠিকই আমরা ইংরেজীকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারি না। কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের মাতৃভাষায় আমরা যতখানি বোঝাতে পারি ইংরেজীতে তার ধারেকাছেও যেতে পারি না। আমাদের শিশু বয়সের বছরগুলোকে ভুলে যাবার দুঃসাহস আমরা কোত্থেকে পাই?

কিন্তু আমরা যাকে উচ্চশিক্ষা বলি, শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তাই করতে থাকি একটা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিখতে গিয়ে। এরফলে আমাদের জীবন পথে বাধা পড়ে—এরজন্য আমাদের প্রচণ্ডভাবে এবং প্রচুর মূল্য দিতে হবে।

আমি একথা বলতে শুনেছি যে যাই হক না কেন ইংরেজী জানা লোকেরাই দেশের জন্য যা করবার করছেন। এটা না করলে খুব সাংঘাতিক ব্যাপার হত। আমরা একমাত্র ইংরেজী শিক্ষাই পাই—নিশ্চয়ই সেটা যে আমরা শিখেছি তা দেখাতে হবে। কিন্তু ধরুন আমরা যদি গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের মাতৃ-ভাষার সবকিছু শিক্ষালাভ করতাম তাহলে আজ আমাদের কি হত? আজ তাহলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হত; আমাদের শিক্ষিত লোকেরা তাঁদের নিজেদের দেশে বিদেশীর মত থাকতেন না, তাঁরা দেশের হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁরা দরিদ্রতম ব্যক্তিদের মধ্যে কাজ করতেন, আর তাঁরা পঞ্চাশ বছর ধরে যা লাভ করতেন তা দেশের ঐতিহ্য হত। এখন এমনকি আমাদের স্ত্রীরা পর্যন্ত আমাদের সর্বোচ্চ চিন্তাধারা বুঝতে পারেন না। একবার দেখুন অধ্যাপক বসু এবং অধ্যাপক রায়ের অদ্ভুত সুন্দর গবেষণার কি অবস্থা। এটা কি লজ্জার কথা নয় যে তাঁদের গবেষণা সাধারণ লোকের সম্পত্তি হতে পারছে না?

সমাজের সবচেয়ে বড় সেবা করা হবে তখন, যখন আমাদের এবং আমাদের সমাজকে ইংরেজী ভাষার প্রতি যে কুসংস্কারছন্ন ভক্তি করতে শিখেছি, তা থেকে মুক্ত করব। স্কুল এবং কলেজে এটা এখন শিক্ষার মাধ্যম। এটা আমাদের দেশের সাধারণ ভাষা হতে চলেছে। আমাদের সর্বোত্তম চিন্তা এই ভাষাতেই হচ্ছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন এই বিশ্বাস আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করছে। সত্যিকারের দেশের কাজের পক্ষে এটা আমাদের অযোগ্য করে তুলছে। যদি এটা অভ্যাসে পরিণত

না হত আমরা তাহলে এটা ঠিকই দেখতে পেতাম যে ইংরেজী আমাদের শিক্ষার বাহন হওয়ায় আমাদের মনীষা আলাদা হয়ে পড়েছে, আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, দেশের সবচেয়ে ভাল মনীষা বন্দী হয়ে পড়েছে, আর আমরা যে সমস্ত নতুন নতুন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি জনসাধারণ তার সুবিধেটা পাচ্ছে না। আমরা এই যাট বছর ধরে কেবলি অপরিচিত কথা মুখস্থ করছি, উচ্চারণ রপ্ত করছি, কিন্তু তথ্যগুলোকে হজম করতে পারছি না। আমরা ভিতের উপর বাড়ি তৈরি না করে বাবা মায়ের কাছ থেকে শিক্ষা না নিয়ে, প্রায় যেন আমরা যা শিখেছি তাও ভুলে যাচ্ছি। ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত আর নেই। এটা দেশের দুরদৃষ্ট।

প্রথমেই সবচেয়ে বড় সমাজসেবা আমরা যা করতে পারি তা হল আবার আমাদের মাতৃভাষায় ফিরে যাওয়া, হিন্দীকে তার স্বাভাবিক স্থান—জাতীয় ভাষায় আবার সংস্থাপিত করা, আর আমাদের যাবতীয় প্রাদেশিক কাজকর্ম মাতৃভাষায় এবং জাতীয় কাজকর্ম হিন্দীতে করা। যতদিন না পর্যন্ত স্কুল কলেজে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রচলিত হয় ততদিন আমাদের বিশ্রাম নেওয়া উচিত নয়।

আজ ইংরেজী শেখা হয় এর বাণিজ্যিক এবং তথাকথিত রাজনৈতিক মূল্যের জন্য। আমাদের ছেলেরা ভাবে, আজকালকার পরিবেশে কথাটা ঠিকই যে ইংরেজী জ্ঞান ছাড়া তারা সরকারী চাকরী পাবে না। মেয়েদের ইংরেজী শেখানো হয় বিয়ের ছাড়পত্র হিসেবে। আমি কয়েকজন মহিলার কথা জানি যাঁরা ইংরেজী শিখতে চান ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলবার সুবিধে পাবেন বলে। আমি অনেক স্বামীদের দেখেছি যাঁরা তাঁদের স্ত্রীরা ইংরেজীতে তাঁদের এবং তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না বলে দুঃখ পান। আমি বহু পরিবার দেখেছি

যাঁরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজী মাতৃভাষার মত করে ব্যবহার করেন। আমার কাছে এটা অসহ্য মনে হয় যে মাতৃভাষাগুলোকে দলিত করে উপোস করিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে এতদিন ধরে। আমি, পিতামাতা সন্তানদের কাছে, বা স্বামীরা স্ত্রীদের কাছে নিজেদের মাতৃভাষায় না লিখে ইংরেজী ব্যবহার করবেন তা সহ্য করতে পারি না।

আমি পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে আমার ঋণ অকপটে স্বীকার করেছি, তবু একথা আমি বলব যে আমি দেশকে যেটুকু সেবা করতে পেরেছি তার পুরোটারই মূলে রয়েছে আমার পূর্ব দেশের সংস্কৃতির যতটা সম্ভব গ্রহণ করেছি তার সবটাই। তা না করলে জনগণের কোনো উপকারেই আমি লাগতাম না, তাদের কাছে আমি হতাম একজন ইংরেজভাবাপন্ন, বিজাতীয় মানুষ, তাদের সম্বন্ধে সামান্যই আমি জানতাম, তাদের কোনোরকম ধার ধারতাম না, এমনকি তাদের জীবনধারাকে, অভ্যাসকে, চিন্তা এবং আশা ভরসাকে আমি ঘৃণা করতাম।

যখনি আমি ছাত্রদের কাছে বলতে গিয়েছি তখনি আমি আশ্চর্য হয়ে দেখেছি তারা দাবী করছে ইংরেজীতে বলতে হবে। আপনারা জানেন, কিংবা আপনাদের জানা উচিত যে আমি ইংরেজী ভাষাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে ভারতীয় ছাত্রেরা, আশা করা যায় যাঁরা তাঁদের ভাগ্যকে ভারতের কোটি কোটি উপছে পড়া জনসমুদ্রের সেবায় নিয়োজিত করবেন, তাঁরা যদি ইংরেজীর চাইতে হিন্দীর উপর বেশি নজর দিতেন তাহলে তাঁরা আরো বেশি সেবা করবার যোগ্যতা অর্জন করতেন। আমি বলি না যে আপনারা ইংরেজী শিখবেন না। শিখুন না যত খুশি, কিন্তু আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি এ ভাষা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ বাড়ির ভাষা হতে পারে না। এই ভাষা হাজারে হাজারে লোকে শিখবে, কিংবা দশ বিশ হাজার লোকে শিখবে, কিন্তু

এ ভাষা লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছুবেনা। তাই ছাত্ররা আমায় হিন্দীতে বলতে বললে আমি খুশী হই।

এবারে জাতীয় ভাষার প্রশ্নে আসা যাক। যদি ভারতবর্ষে ইংরেজীকেই জাতীয় ভাষা করতে হয় তাহলে আমাদের সমস্ত স্কুলে এটাকে বাধ্যতামূলক বিষয় করা উচিত। প্রথমে দেখা যাক ইংরেজী আমাদের জাতীয় ভাষা হতে পারে কিনা।

আমাদের দেশের কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁরা আবার ভাল রকম দেশপ্রেমীও বটেন, বলেন, ওরকম প্রশ্ন তোলার মানেই হল নিজের অজ্ঞতাকে প্রকাশ করা। তাঁদের মতে ইংরেজী আমাদের জাতীয় ভাষার স্থান ইতিমধ্যেই দখল করেছে। ওপর ওপর দেখলে মনে হয় কথাটা সত্যি। আমাদের সমাজের শিক্ষিত লোকদের দেখলে মনে হতে পারে যে ইংরেজী যদি উঠে যায় আমাদের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ইংরেজী আমাদের জাতীয় ভাষা হতেও পারেনা আর হওয়া উচিতও নয়।

দেখা যাক জাতায় ভাষার জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।

১। সরকারী করনিকদের পক্ষে ভাষাটা সহজে শেখার মত হওয়া উচিত।

২। এই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবধারা আদান প্রদান করতে সক্ষম হতে হবে।

৩। এই ভাষায় কথা বলবে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক।

৪। সমগ্র দেশের লোকের পক্ষে এই ভাষা শেখার পক্ষে সহজ হতে হবে।

৫। এই ভাষাকে গ্রহণ করবার সময় সাময়িক বা স্বল্পকাল স্থায়ী কোনো সুবিধে হবে এসব কথা বিবেচনা করলে চলবে না।

এই সমস্ত যোগ্যতার কোনটাই ইংরেজীর নেই। দেখতে হবে, এই পাঁচটি সর্ত আর কোন ভাষা পূরণ করতে পারে? আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে তা হল হিন্দী। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সমস্ত ভারতবর্ষের লোকেদের পক্ষে আন্তঃপ্রাদেশীয় ভাষা হিসেবে সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা হল হিন্দুস্তানী। জনসাধারণের পক্ষে ফারসী ঘেঁষা উর্দু কিংবা সংস্কৃত ঘেঁষা হিন্দীর কোনটাই রপ্ত করা সহজ নয়। বৃটিশ রাজত্ব অবসানের পর ইংরেজী ভাষাকে সাধারণ কথ্য ভাষা বা আদালতের ভাষা হিসেবে চলে যেতে হবে। ইংরেজী জোর করে আমাদের উপর চেপে বসেছে। ইংরেজীর নিজস্ব ক্ষেত্রে আমি তার সম্মান দিই। এটা ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হতে পারে না।

কিন্তু জাতীয় ভাষা নিয়ে এখন গোলমাল বেধে গেছে বলে মনে হয়। জাতীয় ভাষাটা কি হবে? শুনলাম সেটা হবে দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দী। তাতে আমি কোনক্রমেই রাজি হতে পারি না। আমি হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলাম দুবার। আমি হিন্দী বা উর্দুর শত্রু হতে পারি না। তবে আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি আর তা হল সাধারণ মানুষের ভাষা, ভারতবর্ষের সাধারণের কথ্য ভাষা হতে পারে একমাত্র সরল হিন্দী এবং সরল উর্দু দেবনাগরী এবং উর্দু হরফে লেখা, অর্থাৎ হিন্দুস্তানী ভাষা। মুসলমানদের কথা ছেড়ে দিন, আমি এমন হিন্দুকে জানি যাঁরা সংস্কৃত ঘেঁষা হিন্দী বুঝতে পারেন না, বা দেবনাগরী হরফে লিখতে পারেন না। তাই আমি প্রয়োজন হলে একাই হিন্দুস্তানীকে আঁকড়ে ধরে থাকব।

একটি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে যেভাবে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাতে অপরিমেয় বুদ্ধি এবং নীতিগত আঘাত পড়েছে জাতির উপর। আমাদের কালের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকার ফলে

ক্ষতির প্রচণ্ডতা বিচার করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর আমরা যাঁরা এইভাবে শিক্ষা লাভ করেছি তাঁরাই হয়েছেন শিকার, এবং তাঁদেরই হতে হচ্ছে বিচারক—কাজটা প্রায় অসম্ভব। যতই বাধা থাক না কেন অবিলম্বে শিক্ষার মাধ্যমকে বদলাতেই হবে, সেই সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে যোগ্য স্থান করে দিতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিদিনের পাপপূর্ণ অপচয় হবার চাইতে বরং সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খলা আমি মেনে নিতে রাজি আছি।

সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হয়েছে। আমি যে যুগে মানুষ হয়েছি সে যুগে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হত। আমি মনে করি না এরকম শিক্ষার ফলে সময় বা শক্তির অপব্যয় হয়। আমি বিশ্বাস করি আধুনিক ভাষা শিক্ষায় এই ভাষা সাহায্য করে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার চাইতে ভাল আর কোনো প্রাচীন ভাষা নেই, প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীরই উচিত এই ভাষা শিক্ষা করা। কারণ এর ফলে প্রাদেশিক ভাষাগুলি শেখা অন্য যে কোনো উপায়ের চাইতে সহজতর হয়। এই ভাষায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা চিন্তা করতেন এবং লিখতেন। যারা তাঁদের ধর্মের অন্তর্নিহিত রস পান করতে চায় সেই সমস্ত হিন্দু ছেলেমেয়ের সংস্কৃত ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান লাভ না করে থাকা উচিত নয়।

(জ) ছাত্রদের প্রতি

যেরকম অবস্থা এখন রয়েছে আমাদের চিন্তা করতে হবে ছাত্রদের পক্ষে কি কি করা সম্ভব, আর দেশ সেবার ব্যাপারে আমরা আরো কি করতে পারি। যে উত্তর আমি পেয়েছি, এবং আরো অনেকে যাঁরা ছাত্র জগতের কাছ থেকে অনেক ভাল কিছু প্রত্যাশা

করেন তাঁরাও যে উত্তর পেয়েছেন সেটা হল যে ছাত্রদের নিজেদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে, তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি যত্ন নিতে হবে। পুরোদস্তুর শিক্ষা লাভের জন্য একটি সর্ত মানতেই হবে, আর তা হল ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা বজায় রাখা, আর আমি যে হাজার হাজার ছাত্রদের সঙ্গে মিশেছি, চিঠিপত্র পেয়েছি যাতে তারা তাদের মনের সমস্ত গোপন কথা আমাকে একান্তে জানিয়েছে, তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে এখনো অনেক কিছু করবার আছে। চরিত্র গঠনই সমস্ত জ্ঞানের শেষ কথা। আমি যখন খৃষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং আরো অন্যান্য মহান ধর্ম বিষয় নিয়ে অনুধাবন করছিলাম, তখন আমি দেখেছিলাম যে অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা মূল ঐক্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তা হল সত্য এবং অপরাধ শূন্যতা। অপরাধ শূন্যতা—কথাটাকে তোমাদের আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, এর অর্থ হবে হত্যা না করা এবং অহিংসা। আর যদি, তোমরা ছেলের দল সর্বদা দৃঢ়ভাবে সত্য এবং অপরাধ শূন্যতার পক্ষে থাকো, তাহলে তোমরা যে বেশ দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছ সেটা বুঝতে পারবে।

সমস্ত তালা খুলবার যে চাবী তা হল সত্যবাদিতা। যে কোনো অবস্থাতেই হক না কেন কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। কিছুই গোপন রাখবে না, তোমাদের শিক্ষক এবং গুরুজনদের সব কথা খুলে বলে বুকটাকে হালকা করে ফেল। কারুর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করো না, কারুর সম্বন্ধে মন্দ বলোনা আর সবচেয়ে বড় কথা নিজের কাছে নিজে সত্য হও তাহলে আর কারুর কাছেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে হবে না। সবচেয়ে ক্ষুদ্র ব্যাপারেও সত্য ভাব অবলম্বন করাই খাঁটি জীবন যাপনের রহস্য।

ছেলে মেয়েদের তাই আমি বলি কখনো ভগবানে বিশ্বাস হারিও না, আর তার অর্থই হল নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিও না। আর

মনে রেখো যদি তুমি একটাও পাপ মনে পোষণ করো তাহলেই বুঝতে হবে তোমার বিশ্বাসের অভাব আছে। মিথ্যাবাদিত্ব, পরোপকার না করা, হিংসা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা—এ সমস্তই ঐ বিশ্বাসের পরিপন্থী। মনে রেখো এ জগতে আমাদের চেয়ে বড় শত্রু আর কেউ নেই। ভাগবত গীতার প্রায় প্রতিটি স্তবকে একথা ঘোষণা করা আছে। আমাকে যদি (যীশু খৃষ্টের) পাহাড় থেকে প্রচারিত বাণীগুলোকে কম কথায় বলতে হত তাহলে একই সিদ্ধান্তে পৌছুতে হত। আমি কোরান পড়েও ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি। আমরা আমাদের যতখানি ক্ষতি করতে পারি অন্য কেউই ততখানি পারে না। যদি তোমরা, সাহসী ছেলেমেয়েও হও তাহলে এই সমস্ত চিন্তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে মরীয়া হয়ে লড়াই করবে। এ জগতে পাপ চিন্তা না করে কোনো পাপ কাজ হয়নি। তোমাদের সদা সর্বদা অন্তরের চিন্তার উপর কঠোরভাবে খবরদারি করতে হবে।

আমি বেশ কিছু ছেলেকে নিয়ে পরীক্ষা করেছি এটা দেখবার জন্য যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন উপায়ে তাদের ধর্ম নির্দেশ দেওয়া যায়। আমি দেখলাম বইতে যে সব কথা লেখা আছে তা পড়লে খানিকটা সাহায্য হয় বটে, কিন্তু কেবল বই পড়ায় কোনো কাজ হয় না। আমি দেখেছি ধর্ম নির্দেশ দিতে পারেন একমাত্র সেই সমস্ত গুরু যাঁরা নিজেরা সেই ধর্মানুযায়ী জীবন যাপন করেন। আমি দেখেছি যে ছেলেরা গুরুদের জীবন থেকে যা গ্রহণ করতে পারে, যে সমস্ত বই তাদের পড়ে শোনানো হয় কিংবা গুরুরা যেসব বক্তৃতা দেন, তার পরিমাণ অনেক বেশি। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করেছি যে ছেলেমেয়েদের গভীরে প্রবেশ করবার মত ক্ষমতা আছে, যা তারা জানেনা, যে ক্ষমতার সাহায্যে তারা বুঝতে পারে তাদের গুরু সত্যি সত্যি কি ভাবছেন। সেইসব গুরুদের দুর্ভাগ্য, যাঁরা মুখে একরকম শেখান, আর মনে আর এক রকম ধারণা পোষণ করেন।

তোমাদের সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি, শেক্সপীয়র এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থএর রচনা পাঠ বৃথা হবে যদি না তোমরা সেই সঙ্গে তোমাদের চরিত্র গঠন করে, নিজেদের চিন্তাকে কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারো। যখন তোমরা নিজেদের উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা পাবে, নিজেদের আবেগ গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে তখন আর তোমরা হতাশার গান গাইবে না।

আমরা গ্রাম্য সভ্যতা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। আমাদের
দেশের বিশালত্ব, আমাদের বিপুল জনসংখ্যা, আমাদের দেশের
অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদি মিলে আমার মনে হয় এগুলি সবই
গ্রাম্য সভ্যতার জন্যেই উৎসর্গীকৃত। এর ত্রুটিগুলো জানা আছে
ভাল করেই, তবে কোনো ত্রুটিই অসংশোধনীয় নয়। এই
সভ্যতাকে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলে শহুরে সভ্যতা আমদানি করা মনে
হয় একটা অসম্ভব ব্যাপার—যদি না আমরা কোনো কঠোর উপায়ে
আমাদের জনসংখ্যা ত্রিশ কোটি থেকে ত্রিশ লাখে, কিংবা ধরুন
তিন কোটিতে দাঁড় করাতে পারি। আমি এটা ধরে নিয়ে
ত্রুটিগুলোর সংশোধনের কথা বলতে পারি যে আমাদের বর্তমান
গ্রাম্য সভ্যতাকে চালু রাখা হবে আর এর যে সমস্ত ত্রুটি আছে
বলে স্বীকার করা হয় সেগুলোকে দূর করার চেষ্টা করা হবে। এটা
তখনই করা যেতে পারে যখন দেশের যুব সমাজ গ্রাম্য জীবন যাপন
করতে সুরু করবে। আর তারা যদি এটা করতে চায় তাহলে
অবশ্যই তাদের জীবনকে পুনর্গঠিত করতে হবে, ছুটির প্রতিটি দিন
তাদের কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের চারদিকের গ্রামগুলিতে বাস
করতে হবে, আর যাদের শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে কিংবা আর শিক্ষা
নিচ্ছেনা তাদের উচিত গ্রামে গিয়ে বসবাস করার কথা চিন্তা
করা। তারা গ্রামের মধ্যে ঢুকে যাক এবং সেবা, গবেষণা এবং
সত্যিকারের জ্ঞান লাভের অফুরন্ত সুযোগ গ্রহণ করুক। যদি
অধ্যাপকেরা ছেলে কিংবা মেয়েদের ছুটির সময় সাহিত্য পাঠের

বোঝা না চাপিয়ে দেন, তার বদলে তাঁরা যদি তাদের গ্রামে শিক্ষা মূলক ভ্রমণে পাঠিয়ে দেন ত খুব ভাল হয়। ছুটিটা কাটানো উচিত বিনোদনমূলক কাজকর্মে, বই মুখস্থ কখনই করা উচিত নয়।

ছাত্রদের উচিত তাদের অবসর সময়ের কিছুটা, যদি পুরোটা হয় ত ভালই—হাজার হাজার হরিজনদের সেবার জন্য রাখা। আমি দেখেছি যদি অনেকে আমাকে তাদের অবসর সময় দিয়ে সাহায্য করে তাহলে অনেক কাজ হয়।

এই সমস্যার সমাধান কোনো ভাড়াটে শ্রমিকের দ্বারা করানো সম্ভব নয়। যত টাকাই আমাকে দেওয়া হক না কেন আমি এ কাজ করতে পারব না। এটা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার হওয়া উচিত। তোমরা যে স্কুল কলেজে কিরকম শিক্ষা পেয়েছ এই পরীক্ষায় সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। তোমাদের মূল্য কতখানি তা তোমাদের নিখুঁত উচ্চারণে ইংরিজী বলায় প্রকাশ পাবে না। তোমরা দরিদ্রদের জন্য কতখানি সেবা করতে পারো সেটা দিয়েই তোমাদের মূল্য যাচাই করা হবে, তোমরা সরকারে ষাট টাকা কিংবা ছশো টাকা মাইনে পাও তা দিয়ে তোমাদের বিচার করা হবে না। আমার ইচ্ছে তোমরা, আমার কথার মর্ম অনুযায়ী কাজ করবে। আমি একটি ছাত্রেরও দেখা পাইনি যে দিনে এক ঘণ্টা সময় দিতে না পারে। যদি তোমরা দৈনিক কাজকর্মের হিসেব রাখো তাহলে দেখতে পাবে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে বহু ঘণ্টা মূল্যবান সময় নষ্ট করেছ। যদি তোমরা তোমাদের শিক্ষাকে ভালো কাজে লাগাতে চাও তাহলে এদিকে তোমাদের মনোযোগ দেবে। এটা করা শক্ত হলেও এতে ফূর্তি আছে। এতে তোমরা ক্রিকেট বা টেনিসের চাইতেও বেশি আনন্দ পাবে। আমি তোমাদের বলব তোমরা যেন কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অবসর সময় হরিজনদের সেবা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করো।

সত্যিকারের সমস্ত ব্রতচারীকেই আমি আশীর্বাদ জানাই। পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমি বহু ব্রতচারীর সংস্পর্শে এসেছি। সত্যিকারের ব্রতচারীরা সাহসী, বিবেচক, ভদ্র এবং বুদ্ধিমান। কর্তব্য সম্বন্ধে তারা পুরো সজাগ। তারা দেশের নানাস্থানের বহু মেলায় যেখানে লক্ষ লক্ষ জনসমাগম হয় সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার চেষ্টা করে। আমি খুসি হব যদি তারা তাদের সময়ের কিছুটা হরিজনদের সেবায় ব্যয় করে। আমি যে চোখে হরিজনদের বাসস্থান দেখি, যদি সে চোখে যে কেউ তা দেখেন তাহলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবেন যে যাঁদের সেবা করা ইচ্ছে এবং ক্ষমতা রয়েছে তাঁদের সকলের জন্যই প্রচুর সেবার সুযোগ রয়েছে। এরজন্য বিরাট কিছু বুদ্ধিসুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। একমাত্র যা প্রয়োজন তা হল হরিজনদের সঙ্গে একাত্মবোধ করা।

আমার মনে হয় আমি খুব কম কিছু ক্ষেত্র ছাড়া ছাত্রদের ধর্মঘট করার বিরুদ্ধে অনেকবার লিখেছি। আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন বা দলগত রাজনীতি করা ছাত্রদের পক্ষে অন্যায়। এরকম আন্দোলনের ফলে তাদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয় এবং ভবিষ্যতের নাগরিক হবার জন্য যে অখণ্ড কাজ করবার প্রয়োজন তারা সেই কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

ছাত্রদের প্রতি আমার এবং আমার প্রতি ছাত্রদের একটা বিশেষ দাবি আছে, কেননা, আজও আমি নিজেকে একজন ছাত্র বলেই মনে করি, এবং আরো একটি কারণ হল এই যে, আমার ভারতবর্ষে ফিরে আসবার মুহূর্ত থেকে আমি তাদের নিবিড় সংস্পর্শে এসেছি আর তাদের মধ্যে অনেকেই সত্যাগ্রহের কাজে লেগেছে। তাই, যদি সমগ্র ছাত্র সমাজ আমাকে প্রত্যাখ্যান করে কোনো বিশেষ কারণে, যা সাময়িক হতে বাধ্য, আমি কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হবার ভয়ে আমার উপদেশ দিতে বিরত হব না।

ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি করবার অবস্থা নেই। তারা সমস্ত দলের কথা শুনতে পারে—যেমন তারা সমস্ত জাতের বই পড়ে, কিন্তু তাদের কাজ হল সে সমস্ত থেকে সত্য নির্ণয় করে বাকিটা বাতিল করা। এই রকম মনোভাবই একমাত্র সুযোগ্য মনোভাব—যা তারা গ্রহণ করতে পারে। ছাত্র জগতের কাছে দ্বন্দ্বমূলক রাজনীতি অপরিচিত থাকাই উচিত। যখনি তারা ঐ ধরনের কাজ কর্মে এলোমেলোভাবে ব্যাপৃত হতে সুরু করে তারা আর তখন ছাত্র থাকে না, আর তাই দেশের বিপদের সময় দেশকে সেবা করতে পারে না। আমার এই উপদেশ প্রত্যাখ্যান করবার আগে তাদের পঞ্চাশবার ভেবে দেখা উচিত।

প্রশ্ন : ভারতে যখন স্বায়ত্ত শাসন হবে তখন শিক্ষা সম্পর্কে আপনার লক্ষ্য কি ?

উত্তর : চরিত্র গঠন। আমি সাহস, শক্তি, উৎকর্ষ, বড় লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য কাজ করবার সময় নিজেকে ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করব। অক্ষর পরিচয়ের চাইতে এটা বেশি জরুরী। এই মহান লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্যই কেতাবী শিক্ষার প্রয়োজন।

৭। ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য

আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রথম প্রয়োজন হল ভয়শূন্যতা। কাপুরুষেরা কখনো নীতিবান হতে পারে না।

আমরা প্রায়ই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভকে গুলিয়ে ফেলি। আধ্যাত্মিকতা মানে ধর্ম পুস্তক বিষয়ের পড়াশুনা বা দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করা নয়।

এটি হ'ল হৃদয়ের উৎকর্ষসাধন, এর শক্তির পরিমাপ হয় না।

সৎ জীবনযাপন করায় আমরা আদিষ্ট, তার কারণ এ নয় যে তারফলে আমাদের ভাল হবে, তার কারণ এটা হল প্রকৃতির চিরন্তন এবং অমোঘ নিয়ম। পবিত্র কর্তব্য করার মধ্যে নিহিত আছে ভাল করবার জন্য কঠোর চেষ্টা, সে কেবল ভাল করবার জন্যই। ভাল করবার ক্ষমতা বাইরে থেকে আসেনা, সর্বদাই তা আমাদের অন্তরে রয়েছে—কেবল তা আমাদের ঠিকমত উপায়ে বাড়াতে হবে। সবচেয়ে বড় নীতির আইন হ'ল, আমাদের ফেরৎ পাবার আশা না করেই মানব সমাজের জন্য কাজ করে যাওয়া উচিত।

আমাদের জীবনই আমাদেয় হয়ে কথা বলুক, আমাদের নিজেদের বলার চাইতে সেটা অনেক ভাল। বিশ্বাস কথাকে গ্রাহ্য করে না। বিশ্বাসমত জীবনযাপন করলে তা আপনিই প্রচারিত হয়। প্রায়ই মন্দ থেকে ভালর সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা হল ভগবানের, মানুষের পরিকল্পনানুযায়ী নয়। মানুষ জানে মন্দ থেকে কেবল মন্দই হয় আর ভালো থেকে ভালো।

যদি আপনি ভালোর বদলে ভালো করেন তাহলে এটা হল ব্যবসাদারি, এরমধ্যে বিশেষ গুণ কিছু নেই—কিন্তু যদি আপনি মন্দর বদলে ভালো করেন তবেই মুক্তিলাভ হয়। এর সামনে মন্দ দূর হয়ে যায়, আর ক্রমাগত তুষারগোলকের মত এটা পরিমাণে এবং গতিতে বাড়তে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

সেটা কোনো ত্যাগই নয় যদি না সেটা আনন্দের সঙ্গে করা হয়। ত্যাগ এবং প্যাঁচার মত মুখ একসঙ্গে ঠিক মানায় না। ত্যাগ হল "পবিত্রকরণ"। যে মানুষের ত্যাগের জন্য সান্ত্বনার প্রয়োজন হয় মানুষ হিসেবে সে নিকৃষ্ট। এরকম ত্যাগ টেঁকে না।

যুদ্ধের ভেতরে রয়েছে আনন্দ, আনন্দ রয়েছে চেষ্টায়, জয়ে নয়, কষ্টে। এরকম চেষ্টা করার মধ্যেই জয় নিহিত থাকে।

একজন মানুষ তার চিন্তার ফলস্বরূপ—তিনি যেরকম চিন্তা করেন সেরকমই তিনি হন।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সুখ হচ্ছে মনের একটা বিশেষ অবস্থা, আর আমার কথা বলতে পারি, এক পুরুষ ধরে আমি কঠিন পরিশ্রম করে আসছি। আমি আমার পরিবেশ থেকে সুখকে পৃথক করে রাখতে পেরেছি। মানুষ যত অন্য মানুষের ভালোর জন্য কাজ করে সেই পরিমাণেই সে মহান হয়।

যে কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে করা হয় সে কাজ কখনো কষ্টকর বলে মনে হয় না।

একজন লোক যদি কাজে ডুবে থাকেন তাহলে সে কাজকে বোঝা বলে মনে হয় না। ফলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন না, কিন্তু তিনি যদি এতে আনন্দ না পান তাহলে সামান্য কাজই তাঁরপক্ষে বিরাট বলে মনে হবে। মানুষ একদিন বন্দী হলে তাঁর কাছে মনে হবে এক বছর, আর যিনি আমোদ প্রমোদে লিপ্ত, তাঁর কাছে

এক বছরকে মনে হবে একটা দিন। আগে যখন ইউরোপীয় সঙ্গীত আমি শুনেছি তখন আমাকে তা অল্পেই ক্লান্ত করে তুলতো, কিন্তু এখন আমি সেই সঙ্গীতের কিছু কিছু বুঝতে পারি এবং শুনে তারিফ্ করতে পারি।

জন্মগত বিনয় কখনো গোপন থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বিনীত ব্যক্তির জানা থাকে না।

প্রশ্ন : আমাদের শূন্যে পরিণত করার অর্থ কি ?

উত্তর : এর অর্থ, ভাল জিনিস সবচেয়ে শেষে পাওয়া, সকলকে সেবা করা, কৃতজ্ঞতার আশা না করা, এবং দুঃখ সহ্য করার ব্যাপারে প্রথমে এগিয়ে যাওয়া। যিনি নিজেকে এভাবে শূন্যের সঙ্গে এক করে ফেলতে পারেন তিনি সর্বদাই কাজে ডুবে থাকেন।

সাহসের এবং সম্মানের সঙ্গে মৃত্যু বরণের কৌশলের জন্য কোনো বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কেবল ভগবানের প্রতি একটু বিশ্বাস থাকার প্রয়োজন।

মানুষ এবং তাঁর কাজ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ভাল কাজের জন্য অনুমোদন এবং খারাপ কাজের জন্য বিরোধিতা প্রয়োজন। যিনি ভাল কিংবা খারাপ কিছু করেন, কর্ম অনুসারে সর্বদাই শ্রদ্ধা বা কৃপা পাবার অধিকারী।

মানুষ এক বিভাগে ভাল করেন, আবার অন্য বিভাগে খারাপ কাজ করে চলেছেন তা হতে পারে না। জীবন হল সম্পূর্ণ এবং অবিভাজ্য।

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন নিজেকে নীচ বা উচ্চ মনে করবেন ততদিন সাম্য হবে না। সমান সমানদের মধ্যে কর্তাগিরির স্থান নেই।

যে মুহূর্তে আমরা বিরোধীদের মত চিন্তা করতে সুরু করব আমরা তখনি কেবল সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার করতে পারব। আমি জানি

এরজন্য মনের দৃঢ় অবস্থার প্রয়োজন, আর এরকম অবস্থায় পৌঁছুনো যথেষ্ট কঠিন। তা সত্ত্বেও একজন সত্যাগ্রহীর পক্ষে এটি একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা যদি আমাদের প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হই, তাঁদের অবস্থায় নিজেদের প্রক্ষেপ করি তাহলে পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ দুঃখ এবং ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে। তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে চট করে একমত হতে পারি বা তাদের সম্পর্কে সহৃদয়তার সঙ্গে চিন্তা করতে পারি।

এটা বলা একটা বদ অভ্যাস যে অন্যের চিন্তাধারা খারাপ আর কেবল আমাদেরটাই ভাল, এবং যাঁরা আমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে একমত নন তাঁরা দেশের শত্রু।

আসুন, আমাদের প্রতিপক্ষকে এটুকু সম্মান দিই যে তাদের উদ্দেশ্যের সততা আছে এবং তা দেশপ্রেমজাত—যেরকম দাবি আমরা নিজেদের সম্বন্ধে করে থাকি।

সত্যি কথা এই যে আমাকে অনেক সময়েই জব্দ করা হয়েছে। অনেকেই আমাকে ঠকিয়েছে এবং অনেকেই দেখা গেছে অযোগ্য, তবে আমি তাদের সঙ্গে সাহচর্য ছিল বলে তা নিয়ে অনুতাপ করি না কেননা আমি জানি কেমন করে অ-সহযোগ করতে হয়, যেমন জানি কেমন করে করতে হয় সহযোগ। সবচেয়ে কার্যকর, সবচেয়ে মর্যাদার সঙ্গে পৃথিবীতে চলতে গেলে লোকেদের কথায় বিশ্বাস করা উচিত যখন তার উল্টোটা ভাববার কোন কারণ না থাকে। নিশ্চয়ই আমাদের আদর্শ বাণী হওয়া উচিত ভদ্রভাবে লোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ক্রমাগত লোকদের হৃদয়ে এবং বুদ্ধির কাছে আবেদন করা। তাই আমাদের যাঁদের সঙ্গে মতের মিল হয় না তাঁদের প্রতি খুব ভদ্র এবং ধৈর্য্যশীল হতে হবে। আমাদের প্রতিপক্ষরা যে দেশের শত্রু নন তা আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

ত্রুটিএকটি খারাপ জিনিস, তাই সে ব্যাপারে আমাদের লজ্জিত

হওয়া উচিত। কিন্তু তা স্বীকার করা এবং সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা একটা ভাল কাজ। তাই তাতে আমাদের লজ্জিত হবার প্রয়োজন নেই। কোনো ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অন্তর্নিহিত অর্থ হল আর কোনো ত্রুটি যাতে না হয় তার সিদ্ধান্ত করা। এরকম সিদ্ধান্তে কি লজ্জার কিছু থাকতে পারে ?

মানুষ ভুল করে। সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা অগ্রগতির সিঁড়ি তৈরি করি। উল্টোটাও সত্য—যিনি তাঁর ভুলগুলোকে লুকোতে চেষ্টা করেন তিনি জীবন্ত জালিয়াতে পরিণত হন, এবং তলিয়ে যান। যিনি স্বীকারোক্তি পাবার অধিকারা তাঁর কাছে যদি পুরোপুরি সমস্ত দোষ স্বীকার করা হয় আর তার সঙ্গে যদি প্রতিজ্ঞা করা হয় যে এমন পাপ আর করা হবে না, তবে সেটাই হবে সবচেয়ে খাঁটি অনুতাপ।

ভুল স্বীকার করা অনেকটা ঝাঁটার মত—যে ঝাঁটা ধূলো পরিষ্কার করে আগের চাইতেও পরিষ্কার করে। নিজের কাছে মিথ্যা হয়ে থাকার চাইতে পৃথিবীর কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকা দশ লক্ষ গুণ ভাল।

ভুল স্বীকার না করার মত অসম্মানের চাইতে বড় অসম্মান আর নাই।

যিনি মানবসেবা করেন বলে দাবি করেন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তিনি যাঁদের সেবা করছেন তাঁদের প্রতি রুষ্ট না হওয়া।

সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি হল প্রচণ্ড আবেগ এবং সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ উদাসীনতা।

যদি সঠিক পথে থাকবার জন্য যুদ্ধ করা অবশ্যম্ভাবী হয় তবে যুদ্ধ করুন, ভগবান আপনাদের সাহায্য করবেন। আমি আবার বলছি, আপনাদের অধিকার লাভ করবার কোনো রাজকীয় পথ নেই—আত্মশুদ্ধি এবং কষ্টভোগ করতেই হবে।

কিন্তু আত্মসংযম, প্রকৃত আত্ম-সংযমের জন্য নিজেকে সাহসী হতে হবে। যদি এরফলে কেউ দুঃখিত হয় কিংবা সাহস চলে যায় তাহলে এটা যান্ত্রিক কিংবা বাইরে থেকে চাপানো হয়েছে বলে মনে হয়।

মানুষের ত্রুটি সর্বদাই থাকবে, আর সব সময়েই তাকে ত্রুটিহীন হবার চেষ্টা করে যেতে হবে।

সমস্ত সত্য—কেবল সত্য ভাব নয়, সততাপূর্ণ সুখ, অবিকৃত চিত্র, বা গান এসমস্তই অতি সুন্দর। সাধারণত লোকেরা সত্যের মধ্যে সুন্দর খুঁজে পায় না। সাধারণ লোক এ থেকে পালিয়ে যায় আর সুন্দর তাদের চোখে ধরা পড়ে না। যখনি লোকেরা সত্যের মধ্যে সুন্দরের সন্ধান পাবে তখনি সত্যিকারের শিল্পী জন্মগ্রহণ করবে।

সত্যিকারের সুন্দর সৃষ্টি তখনই হতে পারে যখন সত্যিকারের অনুভূতি কাজ করে। এরকম মুহূর্ত জীবনে কম আসে বলেই শিল্পেও এর দেখা মেলে কদাচিৎ।

আমি সত্য কথাকে ঠিক জায়গায় পেঁাছে দিই, তাই মস্তিষ্ক থেকে তা হৃদয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা কেবলমাত্র মস্তিষ্কে থাকে এটা মস্তিষ্কের উপর অকারণ বোঝা হিসেবে চেপে থাকে। যে কোন সত্য মস্তিষ্কে ঢুকলে সেটাকে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে চালান করে দিতে হবে। যখন তা করা হয় না তখন সেটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় আর সেটা মস্তিষ্কে বিষের মত থেকে যায়। যা মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করে তা সমস্ত শরীরকেও করে। তাই মস্তিষ্ককে ঠিকমতো ব্যবহার করতে হবে—যেন এটা একটা খবর পেঁাছে দেবার দপ্তর। এখানে যা খবর আসবে তা হয় হৃদয়ে পেঁাছে দিতে হবে তাড়াতাড়ি সেই অনুসারে কাজ করবার জন্য, নয়তো সেখানেই সেটাকে পাঠানোর অনুপযুক্ত বলে বাতিল করতে হবে। রক্ত মাংসের

শরীরের যা ব্যর্থতা তার অধিকাংশেরই মূলে হল ঠিকমত মস্তিষ্কের কাজ না করা, এবং মানসিক অবসাদেরও ঐ একই কারণ।

আমাদের মধ্যে অনেকেই একটা বিশেষ শ্রেণীতে অবস্থান করে থাকেন। এঁরা কেবলি পড়েন, পড়েন আর পড়েন—পড়তে পড়তে তাঁরা চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। এরকম লোকদের আমি বলি যে তাঁরা পড়া বন্ধ করে দিয়ে আগে যা পড়েছেন তা নিয়ে চিন্তা করুন।

নারী বা পুরুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা হল লোভকে জয় করা। লোভকে জয় না করলে মানুষ নিজেকে শাসন করতে পারে না। আর নিজেকে শাসন করতে না পারলে স্বরাজ বা রামরাজ এর কোনটাই সম্ভব নয়। একটা রঙ করা খেলনা আম বাইরে থেকে দেখতে বড় সুন্দর কিন্তু ভেতরে ফাঁপা এবং বস্তুশূন্য, নিজেকে শাসন না করে অন্যদের শাসন করাটা ঠিক ঐ আমের মতই, প্রতারণা এবং হতাশাপূর্ণ। কোনো কর্মীই লোভ ত্যাগ না করতে পারলে কিছুতেই আশা করতে পারেন না যে তিনি হরিজনদের, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের, খাদির, গো-রক্ষার বা গ্রাম পুনর্নিমাণের জন্য খাঁটি ভাবে কাজ করতে পারবেন। এরকম বড় বড় কাজ কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে করা সম্ভব নয়—এরজন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক চেষ্টা বা আত্মশক্তি। কেবলমাত্র ভগবানের কৃপাতেই আত্মশক্তি আসে, আর যিনি লোভের ক্রীতদাস ভগবানের কৃপা তাঁর কাছে কখনই আসে না।

এবারে ব্রহ্মচর্যের সঠিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করা যাক। এটার মূল অর্থ এভাবে করা যেতে পারে, যে আচার ব্যবহার একজনকে ভগবানের সংস্পর্শে আনে।

এই আচার ব্যবহারের মধ্যে অন্যতম হল সমস্ত চেতনার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। এটা হল কথাটির সত্য এবং প্রাসঙ্গিক অর্থ।

সাধারণভাবে এই কথার অর্থ হল শারীরিক শক্তির সাহায্যে জননেন্দ্রিয় দমন। এই সীমিত অর্থের জন্য ব্রহ্মচর্য অনেক নিচুতে নেমে গেছে আর ব্রহ্মচর্য পালন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত চেতনার উপর কর্তৃত্ব না থাকলে জননেন্দ্রিয় দমন করা অসম্ভব। প্রত্যেকটি চেতনার সঙ্গে প্রত্যেকটির সম্পর্ক রয়েছে। নিচু মানসিকতাও চেতনার মধ্যে বর্তমান। যদি মনের উপর কর্তৃত্ব না করা যায় তাহলে কেবল শারীরিক শক্তি দিয়ে কিছু সময়ের জন্য কর্তৃত্ব করা সম্ভব হলেও, সেটা প্রায় কিংবা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

চিন্তায়, কথায় এবং কাজে ব্রহ্মচর্যকে পালন করতে হবে। শরীরকে দমন করা ক্ষতিকর হতে পারে যদি মনকে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করতে দেওয়া হয়। মন যেখানে চলে বেড়ায় শরীরও সেখানে গিয়ে হাজির হবে কোনো এক সময়ে।

এখানে দুটি বিভাগকে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। মলিন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া এক জিনিস এবং আমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা যদি মলিন চিন্তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সেটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। যদি আমরা যে মন মন্দস্থানে ঘুরে বেড়ায় তার সঙ্গে অসহযোগিতা করি তাহলে জয় আমাদের শেষ পর্যন্ত হবেই।

সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ করা এবং সামগ্রিক ব্রহ্মচর্য হল একটা আদর্শ অবস্থা। যদি এরকম অবস্থায় থাকবার কথা চিন্তা করতে ভয় করে, তাহলে বিয়ে করুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তা হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণ করে জীবন যাপন করুন।

যৌন প্রেরণা একটা সুন্দর এবং মহান ব্যাপার। এতে লজ্জার কিছুই নেই, তবে কেবলমাত্র সৃষ্টির প্রয়োজনেই এটা ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোনভাবে এর ব্যবহার হলে তা হবে ভগবানের এবং মানবতার বিরোধী।

আমরা যদি বিশ্বাস করতে শুরু করি যে জন্তুর মত আবেগে গা ঢেলে দেওয়া প্রয়োজন, অনিষ্টকর নয় এবং নিষ্পাপ তাহলে আমরা এরমধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ব যে তা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলব। আর যদি আমরা নিজেদের এভাবে শিক্ষা দিই যে এরকম করা ক্ষতিকর, পাপপূর্ণ, অপ্রয়োজনীয় এবং একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব আমরা তখন দেখব যে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা সর্তোবভাবে সম্ভব।

ব্রহ্মচর্যহীন জীবন আমার কাছে পান্‌সে এবং জন্তুর মতো মনে হয়। জন্তুর প্রকৃতিই এই যে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং যতখানি সে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে সে ততখানিই মানুষ। আগে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্যের প্রশংসাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হত আমার, কিন্তু এখন আমার কাছে এটা প্রতিদিন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে যে এটা সম্পূর্ণ সঠিক এবং অভিজ্ঞতার উপর এর প্রতিষ্ঠা।

আমি মনেকরি চিন্তায়, বাক্যে এবং কাজে মিতাচার আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন। যে দেশে এরকম মানুষের অভাব সে দেশ সেই হিসাবে দরিদ্রতর। বিবাহিত লোকেদের বিয়ের সত্যিকারের মর্ম বোঝা উচিত—এবং তাঁদের ব্রহ্মচর্যের সমস্ত নিয়ম মেনে চলা উচিত, কেবলমাত্র জাতিকে বেঁচে থাকবার জন্য যে শিশু প্রয়োজন সেই শিশুকে আনবার প্রয়োজনে ছাড়া।

এটা করা খুব কঠিন, তবে আমরা এ পৃথিবীতে জন্মেছি যাতে আমরা কষ্টের সঙ্গে এবং লোভের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে পারি এবং তাদের জয় করতে পারি। যাঁর এরকম মনের জোর নেই তিনি সত্যিকারের স্বাস্থ্যবান হবার মত পরম আশীর্বাদ লাভ করেন না।

আমার সব সময়েই মনে হয়েছে যে ব্রহ্মচর্যের সীমিত অর্থ গ্রহণের ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। যদি আমরা সর্বদিকে আমাদের

আত্মনিয়ন্ত্রণকে একই সঙ্গে প্রসারিত করতে পারি, সেই চেষ্টা হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং সাফল্যের সম্ভাবনা তাতে থাকবে। সম্ভবত ক্ষুধাই সবচেয়ে বড় পাপী।

ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছি, যদি কেউ ক্ষুধার উপর কর্তৃত্ব করতে পারেন তাহলে কৌমার্য পালন করাও খুব সহজ হয়ে পড়ে। একজন আন্তরিক মানুষ, যখন পূর্বেকার ভুলগুলিকে ভুলে গিয়ে খাঁটি জীবন যাপন করতে থাকেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফল পেতে শুরু করবেন। যাঁরা সত্যিকারের ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন—তা খুব কম সময়ের জন্য হলেও, তাঁরা দেখেছেন তাঁদের শরীর এবং মন নিশ্চিতভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। তাঁরা কিছুতেই এই ঐশ্বর্যকে ছেড়ে দেবেন না।

মানুষ পৃথিবীতে এসেছে যাতে সে তার ধার শোধ করতে পারে। কথাটার অর্থ হল, ভগবানকে সেবা করা কিংবা ভগবানের সৃষ্টিকে সেবা করার ভেতর দিয়ে তাঁকে সেবা করা। এই চিন্তা সামনে রেখে মানুষ তার শরীরের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। শরীরকে এভাবে যত্ন নেওয়া তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যাতে সে সেবার আদর্শকে তার যতদূর সাধ্য রূপ দিতে পারে।

যদিও মৃত্যু এবং জীবন একই মুদ্রার দুটো পিঠ, এবং যদিও আমাদের উচিত যেভাবে বেঁচে আনন্দ পাই সেরকম আনন্দ পাই মৃত্যুতেও, তবু যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ দেহকে তার প্রাপ্য দিয়ে যেতে হবে। এই ভারটা আমাদের দিয়েছেন ভগবান। দেহের প্রতি আমাদের সমস্তরকম সঙ্গত যত্ন নেওয়া উচিত।

আমাদের অন্তরের আত্মার বিবর্তনকে সাহায্য করে যে শরীর সেই শরীর সম্পর্কে সাধারণ লোকের একটা মোটামুটি কাজ চালানোর মত জ্ঞান থাকা উচিত। অথচ এরকম দুঃখজনক

অজ্ঞতা বোধ হয় আর কোনো বিষয়ে আমাদের নেই যেমন আছে আমাদের দেহ সম্বন্ধে। শরীরকে দেবমন্দির হিসেবে বিবেচনা না করে, আমরা এর সাহায্যে যথেচ্ছাচার করে থাকি, আর আরো যথেচ্ছাচার যাতে এই মানবরূপী মন্দিরে করা যায় সেজন্য ডাক্তারদের কাছে সাহায্য নিতে দৌড়োদৌড়ি করতে লজ্জাবোধ করি না।

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করা যায় ভগবানের নিয়মকানুন মান্য করে, শয়তানের শক্তিকে অমান্য করে। সত্যিকারের সুখভোগ সত্যিকারের স্বাস্থ্য ছাড়া করা অসম্ভব। আর কঠোরভাবে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ না করলে সত্যিকারের স্বাস্থ্য লাভ অসম্ভব। একবার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই আর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দমন করার ক্ষমতা আপনিই এসে যায়। যিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দমন করতে পারেন তিনি সত্যিই সমস্ত পৃথিবীকে জয় করেন এবং তিনি ভগবানের অংশ হন।

সমস্ত ধর্মই স্বীকার করেন যে দেহ হল ভগবানের বাসগৃহ। আমাদের এই সর্তে দেহ দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা এর সাহায্যে ভগবানকে পরম বিশ্বস্তভাবে সেবা করতে পারি। এই দেহকে অন্তর এবং বাহির থেকে পবিত্র এবং অমলিন রাখা আমাদের কর্তব্য, যাতে আমরা আমাদের দেহকে এই দেহ যিনি দিয়েছেন তাঁকে যে পবিত্রভাবে পেয়েছি সেভাবে ফেরত দিতে পারি। যদি আমরা আমাদের চুক্তিমত কাজ করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তারজন্য আমাদের পুরস্কৃত করবেন এবং অমৃতের উত্তরাধিকারী করবেন।

বাস্তবিক শরীর খুব ভাল ভৃত্য, কিন্তু মনিব হলে এর খারাপ করবার ক্ষমতা অপরিসীম হয়ে পড়ে।

সভ্যতার অন্তর্নিহিত অর্থ অভাব বাড়িয়ে তোলা নয়, বরং স্বেচ্ছায় সুচিন্তিতভাবে অভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা। সত্যিকারের সুখ এবং তৃপ্তি এবং সেবা করার ক্ষমতা তাতেই বাড়তে পারে।

কিছু পরিমাণ শারীরিক সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন কিন্তু বেশির দিকে গেলেই তা সাহায্যের চাইতে ক্ষতিই করে বেশি। তাই অভাবের সংখ্যার সীমা ছাড়িয়ে যাবার এবং সেই অভাবকে পূরণ করে চলার আদর্শের মধ্যে ভ্রান্তি এবং ফাঁদ আছে। একজনের ক্ষুদ্র দৈহিক অভাব বা একজনের বুদ্ধির মানসিক অভাব পূরণের একটা মাত্রা থাকা উচিত। তা নইলে এগুলি শারীরিক এবং মানসিক বিলাসে পরিণত হয়। মানুষের উচিত তার শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাপারে এমনভাবে আয়োজন করা যাতে মানব সেবায় সেগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না—তার সমস্ত শক্তিকে সে বাবদই কাজে লাগানো উচিত।

যখনি মানুষ তার দৈনন্দিন অভাবকে বাড়িয়ে তোলে তখনি সে সাধারণ জীবনযাত্রা এবং অসাধারণ চিন্তার আদর্শ থেকে পতিত হয়। ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ আছে। পরিতৃপ্তির মধ্যেই মানুষের সুখ। যিনি অপরিতৃপ্ত তাঁর যতকিছুই থাকুক না কেন, তিনি তাঁর কামনার ক্রীতদাসে পরিণত হন। কামনার চাইতে বড় ক্রীতদাসত্ব সত্যি আর কিছু নেই। সমস্ত জ্ঞানীজন উচ্চস্থান থেকে চিৎকার করে বলে গেছেন যে মানুষ নিজেই তার সবচেয়ে বড় শত্রু যেমন হতে পারে তেমনি হতে পারে বন্ধুও। স্বাধীন হওয়া বা ক্রীতদাস হওয়া তার নিজের উপরেই নির্ভর করে। যা একজন ব্যক্তির পক্ষে সত্য, তা সত্য সমাজের পক্ষেও।

অভিজ্ঞতার ফলে আমি এটা শিখেছি যে সত্যের পূজারীর কাছে নীরবতা হল আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা। বাড়িয়ে বলার অভ্যেস, সত্যকে চেপে যাওয়া বা বদলানো—সে ইচ্ছেয় হক বা অনিচ্ছেয় হক, এগুলো সব মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। এগুলোকে অতিক্রম করতে হলে নীরবতা পালন প্রয়োজন।

যিনি কম কথা বলেন তাঁর কথায় চিন্তাহীনতার ছাপ কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে। তিনি সমস্ত কথাকে বলবার আগে ওজন করে দেখবেন।

এটি (নীরবতা) এখন আমার দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রথমে এটা সুরু করেছিলাম আমার উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য। তখন আমার লিখবার সময়ের প্রয়োজন ছিল। পরে অবশ্য আমি কিছুকাল এই অভ্যেস চালিয়ে গিয়েছি—আমি এর আধ্যত্মিক মূল্য দেখতে পেয়েছি। হঠাৎ এটা আমার মনে খেলে যায় যে সেই সময়ে আমি ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারতাম। এখন আমার মনে হয় এই নীরবতার জন্যই যেন স্বাভাবিকভাবে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

তিনিই সত্যিকারের নীরব ব্যক্তি যিনি কথা বলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও একটি বাজে কথা বলেন না।

৮। আমরা সবাই মানব পরিবারের লোক

আমি ভারতবর্ষের একজন দীন সেবক—ভারতবর্ষকে সেবা করার চেষ্টা করছি। আমি বৃহত্তর মানব সমাজকে সেবা করি··· প্রায় পঞ্চাশ বছর জনসাধারণের ভেতর কাজ করবার পর আজ আমি বলতে পারি যে নিজের দেশ সেবার ধর্মের সঙ্গে বিশ্বকে সেবা করার ধর্ম অসংবদ্ধ নয়, সেই বিশ্বাস আরো বড় হয়েছে। এটা খুব ভাল ধর্ম। একমাত্র এটা মেনে নিলেই পৃথিবীর পরিস্থিতি সহজ হয়ে আসবে এবং ভূগোলকের বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার অধিবাসীদের পারস্পরিক ঈর্ষা দূর হবে।

ভগবান আমাকে ভারতবর্ষের লোকেদের মধ্যে পাঠিয়েছেন, আমার স্রষ্টিকর্তার কাছে আমি মিথ্যা প্রতিপন্ন হব যদি না আমি তাদের সেবা করি। আমি যদি কেমন করে তাদের সেবা করতে হয় তা না জানি তাহলে কেমন করে মানবতাকে সেবা করতে হয় তা আমি কখনই জানতে পারবো না। আর আমি যদি আমার দেশকে সেবা করতে গিয়ে অন্য দেশের ক্ষতি না করি, তাহলে আমার ভুল পথে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম।

জাতীয়তাবাদী না হলে একজনের পক্ষে আন্তর্জাতীয়তাবাদী হওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদ সত্য হলেই, অর্থাৎ যখন বিভিন্ন দেশের মানুষেরা নিজেদের সংগঠিত এবং এক হয়ে কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে কেবল তখনই আন্তর্জাতীয়তাবাদ সম্ভব।

জাতীয়তাবাদের মধ্যে অমঙ্গলের কিছু নেই—ক্ষুদ্রত্ব, স্বার্থপরতা যা কিনা আজকালকার দেশগুলোর সর্বনাশের কারণ, এগুলিই হল

অমঙ্গলকর। প্রত্যেকে অন্যকে ক্ষতি করে নিজে লাভ করতে চায়, প্রত্যেকে অন্যকে ধ্বংস করে নিজে উঠতে চায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অন্য পথ বার করেছে। এই জাতীয়তাবাদ নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে চায়, কিংবা নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে চায় যাতে সমগ্র মানব সমাজকে উপকার এবং সেবা করতে পারে।

আমার জীবনের উদ্দেশ্য কেবল ভারতীয় জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব আনা নয়। আমার উদ্দেশ্য কেবল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনাও নয়, যদিও এটা নিঃসন্দেহে আমার প্রায় সমস্ত জীবন এবং সময় জুড়ে রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের ভেতর দিয়ে আশা করি আমি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব আনতে পারব। আমার দেশপ্রেম একচেটিয়া কিছু ব্যাপার নয়। এটা সমস্ত স্থানেই ব্যাপ্ত এবং আমি সেই দেশ প্রেমকে বাতিল করব যে দেশপ্রেম অন্য দেশকে দুর্দশায় ফেলে বা শোষণ করে বড় হয়। আমার দেশপ্রেম সম্পর্কে ধারণা প্রতিটি ক্ষেত্রে, ব্যতিক্রমবিহীনভাবে বৃহত্তর মানবতার মঙ্গল বিধানের সঙ্গে সুসংবদ্ধ—এ ছাড়া দেশপ্রেম হয় বলে আমার মনে হয় না। কেবল তাই নয় আমার ধর্ম এবং আমার দেশপ্রেম যা আমার ধর্ম থেকে উদ্ভূত, এ দুইই সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত।

আমার ধারণার পূর্ণ স্বরাজ একটা আলাদা করে পাওয়া স্বাধীনতা নয়, বরং সুস্থ এবং মর্যাদাপূর্ণ পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা। আমার জাতীয়তাবাদ যদিও তা প্রচণ্ড, কিন্তু একচেটিয়া নয়, বা কোন দেশ বা ব্যক্তির ক্ষতিও করতে চায় না। আইনের নিয়মগুলো আইনসঙ্গত যতখানি নয়, তার চাইতে বেশি নীতিপূর্ণ। আমি এই কথাটার চিরকালীন সত্য বিশ্বাস করি, "আপনি নিজের সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করুন যাতে প্রতিবেশীর ক্ষতি না হয়।"

আমাদের জাতীয়তাবাদ অন্য কোনো দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হবে না – এমন কি আমরা যেমন আমাদের শোষিত হতে দেব না তেমনি আমরা কাউকে শোষণ করবও না। স্বরাজের ভেতর দিয়ে আমরা সমগ্র পৃথিবীর সেবা করব।

আমাদের জাতীয় সীমারেখার বাইরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমাদের সেবার কোনো সীমা থাকবে না, কারণ এইরকম সীমারেখা ভগবান তৈরি করেননি।

আমরা আমাদের দেশের জন্য স্বাধীনতা চাই, কিন্তু অন্যকে শোষণ করে নয়—এমন কি অন্য কোনো দেশকে হীন করেও নয়। যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ফলে ইংল্যাণ্ড বা ইংরেজ বিলুপ্ত হয় তাহলে সেরকম স্বাধীনতা আমার চাই না। আমি আমার দেশের জন্য স্বাধীনতা চাই, যাতে অন্য দেশ আমাদের স্বাধীন দেশ থেকে কিছু শিখতে পারে, যাতে আমাদের দেশের সম্ভারকে মানবসমাজের কাছে লাগানো যেতে পারে। যেমন দেশপ্রেম-ধর্ম আজ আমাদের শিখিয়েছে, একটি পরিবারের জন্য ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য পরিবারকে, জেলার জন্য গ্রামকে, প্রদেশের জন্য জেলাকে এবং দেশের জন্য প্রদেশকে মৃত্যু বরণ করতে হয়, তেমনি একটি দেশকে স্বাধীন হতে হয় এই জন্যই যাতে, যখন প্রয়োজন হয় তখন সে পৃথিবীর উপকারের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারে। আমি যে জাতীয়তাবাদকে ভালবাসি, বা জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে আমার দেশ মরতে পারে যদি তার ফলে মানবজাতি বেঁচে থাকতে পারে। সেখানে জাতি বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। আমাদের জাতীয়তাবাদ সেরকমই হক।

আমাদের একই তুলি দিয়ে কালো আলকাতরা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা একই মানব পরিবারের সন্তান সন্ততি। আমি এরমধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করি না। আমি দাবি করিনা যে ভারতবর্ষের লোকেরা শ্রেষ্ঠ—আমাদের একই রকম গুণ এবং দোষ রয়েছে। মানব জাতিকে ভাগ ভাগ করে জল নিরোধক ঘরে ঘরে আটকে রাখা হয়নি যাতে একজন অন্য ঘরে যেতে পারবে না। তারা হাজারটা ঘর অধিকার করে থাকতে পারে কিন্তু তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মীয়। আমি বলিনা, "ভারতবর্ষ সর্বেসর্বা, আর সমস্ত পৃথিবী গোল্লায় যাক।" আমার বাণী তা নয়। ভারতবর্ষের সর্বেসর্বা হওয়া উচিত তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। আমি ভারতবর্ষকে অক্ষত রাখতে পারি—এর স্বাধীনতাকেও, যদি সমস্ত মানব পরিবারের জন্য আমার মঙ্গল কামনা থাকে—কেবল পৃথিবীর একটা ছোট জায়গা, যাকে বলা হয় ভারতবর্ষ সেখানকার মানব পরিবারের জন্য নয়। অনেক ছোট দেশের চাইতে ভারতবর্ষ তুলনায় বেশ বড়ই, কিন্তু বিশাল পৃথিবীর বা বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষ কতটুকু ?

আমি একথা অতি দীনভাবে নিবেদন করতে সাহসী হচ্ছি যে যদি ভারতবর্ষ, সত্য এবং অহিংসার সাহায্যে তার উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুতে পারে, তাহলে পৃথিবীর শান্তি রক্ষায় তার দান কম হবে না, যে শান্তির জন্য পৃথিবীর সমগ্র দেশ তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে। তা যদি হয় তাহলে ভারতবর্ষ এ যাবত যে সমস্ত সাহায্য নানা দেশ থেকে পেয়ে এসেছে তার কিছুটা ফিরিয়ে দিতে পারবে সে সব দেশকে।

বিশ্বাস করুন, আমি যখন আমার দেশের স্বাধীনতা চাই, কোনক্রমেও যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমি পৃথিবীর মানব জাতির পাঁচ ভাগের এক ভাগের একজন হিসেবে, পৃথিবীর কোনো দেশ বা এমন কি কোনো একজন লোককেও শোষণ করার জন্য সে স্বাধীনতা চাই না। যদি আমি সেই স্বাধীনতা আমার দেশের জন্য চাই তাহলে সে স্বাধীনতা পাবার অধিকারী আমি নই যদি না আমি সমস্ত জাত, তা সবলই হক বা দুর্বলই হক তারা প্রত্যেকে সমান অধিকারী একথাটা মূল্যবান মনে করি এবং সযত্নে পোষণ করি।

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার